তুলনায় বেশী ছিল, কিন্তু এর একটি যের ও যবর পরিবর্তন করার সাধ্যও কারো হয়নি। অবশ্য একটি তৃতীয় প্রকার পরিবর্তন সম্ভবপর ছিল। তা এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনকে রহিত করে পরিবর্তন করতে পারতেন। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন---এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সর্বশেষ পয়গম্বর এবং কোরআন সর্বশেষ গ্রন্থ। একে রহিতকরণের আর কোন সম্ভাবনা নেই। কোরআনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটি আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ — অর্থাৎ তারা যেসব কথাবার্তা বলছে, আল্লাহ্ সব শোনেন এবং সবার অবস্থা জানেন। তিনি প্রত্যেকের কার্যের প্রতিফল দেবেন।

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবহিত করেছেন যে, পৃথিবীর অধিবাসীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট। আপনি এতে ভীত হবেন না এবং তাদের কথায় কর্ণপাত করবেন না। কোরআন একাধিক জায়গায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَمَا اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ — উদ্দেশ্য এই যে, সংখ্যাধিক্যের ভীতি স্বভাবতই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ফলে মানুষ তাদের আনুগত্য করতে থাকে। কাজেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে ঃ

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক এমন রয়েছে যে, আপনি যদি তাদের নির্দেশ মান্য করেন, তবে তারা আপনাকে বিপথগামী করে দেবে। কেননা, তারা বিশ্বাস ও মতবাদে শুধুমাত্র কল্পনা ও কুসংস্কারের পেছনে চলে এবং বিধি-বিধানে একমাত্র ভিত্তিহীন অনুমান দ্বারা চালিত হয়।

মোট কথা, আপনি তাদের সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে তাদের সাথে একাত্মতার কথা চিন্তাও করবেন না। কারণ এরা সবাই নীতিহীন ও বিপথগামী।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্র পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়ে যায় এবং যারা আল্লাহ্র পথে চলে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের সবাইকে জানেন। অতএব, তিনি বিপথগামীদের যেমন শাস্তি দেবেন, তেমনি সরল পথের অনুসারীদেরও পুরস্কৃত করবেন।

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾ وَمَا
لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ اِلَيْهِ ؕ وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَآئِهِمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ﴿١١٩﴾ وَذَرُوْا ظَاهِرَ
الْاِثْمِ وَبَاطِنَهٗ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا
يَقْتَرِفُوْنَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ
وَاِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰٓى اَوْلِيٰٓئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ
اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴿١٢١﴾

(১১৮) অতঃপর যে জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ কর—যদি তোমরা তাঁর বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। (১১৯) কোন্ কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, অথচ আল্লাহ্ ঐ সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্য হারাম করেছেন; কিন্তু সেগুলোও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে যাও। অনেক লোক স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা অন্যকে বিপথগামী করতে থাকে। আপনার পালনকর্তা সীমা অতিক্রমকারীদের যথার্থই জানেন। (১২০) তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ্ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা গোনাহ্ করছে, তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (১২১) যেসব জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না; এ ভক্ষণ করা গোনাহ্। নিশ্চয় শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্রত্যাদেশ করে—যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে।

যোগসূত্র: পূর্ববর্তী আয়াতে وَاِنْ تُطِعْ শব্দে বিপথগামীদের অনুসরণ সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ বিষয়ে অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঘটনাটি যবেহকৃত ও অ-যবেহ্‌কৃত জন্তুর হালাল হওয়া সম্পর্কিত। ঘটনা এই যে, কাফিররা মুসলমানদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বলল যে, তোমরা অদ্ভুত লোক বটে, আল্লাহ্‌র মারা জন্তুকে তো তোমরা খাও না, কিন্তু নিজের মারা অর্থাৎ যবেহ করা জন্তুর মাংস খেতে দ্বিধা কর না।---(আবূ দাউদ,

হাকেম) কোন কোন সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে এসে এ সন্দেহ বর্ণনা করেন। এতে আলোচ্য আয়াতসমূহ لَمُشْرِكُوْنَ পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়।---(আবূ দাউদ, তিরমিযী)

উত্তরের সারমর্ম এই যে, তোমরা মুসলমান---আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান মেনে চলতে সংকল্পবদ্ধ। কোন্‌টি হারাম আর কোন্‌টি হালাল তা আল্লাহ্ তা'আলা বিস্তারিত বর্ণনা করে দিয়েছেন। অতএব, এ বর্ণনা অনুযায়ী চলতে থাক। হালাল বস্তুকে হারাম এবং হারাম বস্তুকে হালাল হওয়ার সন্দেহ করো না এবং মুশরিকদের কুমন্ত্রণার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করো না।

এ উত্তর সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা এই যে, মূলনীতি সপ্রমাণের জন্য যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু মূলনীতি প্রমাণিত হয়ে গেলে তার বাস্তবায়ন ও শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে دلائل نقلية অর্থাৎ ঐতিহাসিক প্রমাণাদিই যথেষ্ট, যুক্তি-ভিত্তিক প্রমাণাদির প্রয়োজন নেই বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা ক্ষতিকর। কারণ এতে সন্দেহ ও সংশয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়। কেননা, শাখা-প্রশাখার ক্ষেত্রে অকাট্য প্রমাণাদির অবকাশ নেই। তবে কোন সত্যান্বেষী আন্তরিক সন্তুষ্টি প্রত্যাশীর সামনে অকাট্য প্রমাণাদি প্রাসঙ্গিকভাবে বর্ণনা করে দিলে ক্ষতি নেই। কিন্তু বিতর্কের ক্ষেত্রে তা না করে আপন কাজে মগ্ন হওয়া এবং আপত্তিকারীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করাই বাঞ্ছনীয়। হ্যাঁ, আপত্তিকারী যদি কোন শাখার যুক্তিগত অকাট্য প্রমাণের পরিপন্থী হওয়া প্রমাণ করতে চায়, তবে তার উত্তর দেওয়া ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু মুশরিকদের এ সংশয় সৃষ্টিতে এমন কোন আশংকাই নেই। তাই এর উত্তরে শুধু মুসলমানদের উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী সম্বোধন করা হয়েছে যে, এসব বাজে কথায় কান দিয়ো না; সত্যে বিশ্বাসী ও কর্মী হয়ে থাক। এ হিসাবে আলোচ্য আয়াতে মুশরিকদের সন্দেহের স্পষ্ট ভাষায় উত্তর না দেওয়াতে কোনরূপ আপত্তি করা যায় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আয়াতে كُلُوْا অর্থাৎ খাওয়ার আদেশ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ এবং لَا تَأْكُلُوْا অর্থাৎ খাওয়ার নিষেধে لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ ---উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত নিয়ম ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, ذُكِرَ اسْمُ اللهِ যবেহ করার সময় হবে এবং لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ—দু'ভাবে হবে ঃ এক. যবেহ না করা ; এবং দুই. যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করা। অতএব, উত্তরের সারমর্ম এই যে, দু'টি বিষয়ের সমষ্টির উপরই হালাল হওয়া নির্ভরশীল ঃ এক. যবেহ, যা অপবিত্র রক্ত বের করে দিয়ে জন্তুকে পবিত্র করে দেয়। এ অপবিত্রতাই হালাল না হওয়ার কারণ ছিল। দুই. আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা। এটি বরকতের কারণ এবং রক্তবিশিষ্ট জন্তুসমূহের হালাল হওয়ার শর্ত। কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রাপ্তির জন্য পরিপন্থী

বিষয়কে দূর করা এবং শর্ত বিদ্যমান হওয়া দুইটি-ই জরুরী। অতএব এতদুভয়ের সমষ্টি দ্বারা বৈধতা প্রমাণিত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বে যখন জানা গেল যে, কাফিরদের অনুসরণ নিন্দনীয়) অতএব যে (হালাল) জন্তুর উপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহ্‌র নাম (শরীকবিহীনভাবে) উচ্চারিত হয় তা থেকে (নির্বিঘ্নে) ভক্ষণ কর (এবং তাকে অনুমোদিত ও হালাল মনে কর---) যদি তোমরা তাঁর বিধানসমূহে বিশ্বাসী হও। (কেননা, হালালকে হারাম মনে করা বিশ্বাসের পরিপন্থী।) এবং কোন (বিশ্বাসজনিত) কারণে তোমরা এমন জন্তু থেকে ভক্ষণ করবে না, যার উপর (যবেহ করার সময়) আল্লাহ্‌র নাম (শরীকবিহীনভাবে) উচ্চারিত হয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা (অন্য আয়াতে) ঐ সব জন্তুর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন, যেগুলোকে তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। কিন্তু তাও তোমাদের জন্য হালাল, যখন তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়। (আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করা জন্তু হারামের সে বিবরণের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমতাবস্থায় তা ভক্ষণ করতে বিশ্বাসগত দ্বিধা কেন? মুশরিকদের সন্দেহ সৃষ্টির প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করো না কেননা,) নিশ্চয়ই অনেক লোক (তাদের মধ্যে এরাও, যারা নিজের সাথে অন্যান্যকেও) স্বীয় ভ্রান্ত প্রবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞতাবশত বিপথগামী করে (কিন্তু কতদিন তারা এ কাজ করবে।) এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা (ঈমানের) সীমা অতিক্রমকারীদের (যাদের মধ্যে এরাও রয়েছে,) খুব পরিজ্ঞাত আছেন। (সুতরাং একযোগে শাস্তি দেবেন।) এবং তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ্ পরিত্যাগ কর। (উদাহরণত হালালকে হারাম মনে করা প্রচ্ছন্ন গোনাহ্। এর বিপরীতটিও তেমনি) নিশ্চয় যারা গোনাহ্ করছে, তারা অতি সত্বর (কিয়ামতে) তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে এবং যেসব জন্তুর উপর (উল্লিখিত নিয়মে) আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত না হয়, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না (যেমন, মুশরিকদের এমন জন্তু ভক্ষণ করা) এবং নিশ্চয় এটা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়নি এমন জন্তু ভক্ষণ করা) দুষ্কর্ম। (মোটকথা, বর্জন ও গ্রহণ কোন কিছুতেই তাদের অনুসরণ করো না।) এবং (তাদের সন্দেহ-সংশয় ভ্রূক্ষেপযোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে,) অবশ্যই শয়তানরা তাদের (এসব) বন্ধুদের (এবং অনুসারীদের এসব সন্দেহ) শিক্ষা দেয়, যেন তারা তোমাদের সাথে (অনর্থক) তর্ক করে। (অর্থাৎ প্রথমত এসব সন্দেহ কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী। দ্বিতীয়ত, এগুলোর উদ্দেশ্য শুধু তর্ক-বিতর্ক করা। তাই এসব ভ্রূক্ষেপযোগ্য নয়।) বস্তুত যদি তোমরা (আল্লাহ্ না করুক) তাদের (বিশ্বাস অথবা কর্মে) আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। (কারণ, এতে আল্লাহ্‌র শিক্ষার উপর অন্যের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, অথচ উভয় শিক্ষাকে সমতুল্য মনে করাও শিরক। অর্থাৎ তাদের আনুগত্য শিরকতুল্যই মন্দ কাজ। তাই এর ভূমিকা অর্থাৎ ভ্রূক্ষেপ করা থেকেও বিরত থাকা কর্তব্য)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ—এ বাক্যে ইচ্ছাধীন যবেহ ও নিরুপায় অবস্থার যবেহ

---উভয় প্রকার যবেহকেই বোঝানো হয়েছে। নিরুপায় অবস্থার যবেহ হচ্ছে তীর, বাজ-পক্ষী ও কুকুরের শিকার করা জন্তু। এগুলো ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ্ পাঠ করলে এদের শিকার করা জন্তু জীবিত না পাওয়া গেলেও তাকে যবেহ করা জন্তু বলেই মনে করতে হবে। অবশ্যই জীবিত পাওয়া গেলে ইচ্ছাধীনভাবে যবেহ করতে হবে। যবেহ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণও দুই প্রকার হতে পারে---এক. সত্যিকার উচ্চারণ এবং দুই. --- অসত্যিকার ও নির্দেশগত উচ্চারণ। যেমন, মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক ভুলক্রমে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করে যবেহ করা। ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে ভুলক্রমে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ না করলেও তা উপরোক্ত বাক্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং হালাল হবে। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে উচ্চারণ না করলে হারাম হবে।

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

(১২২) আর যে মৃত ছিল অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে—সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এমনিভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত (অর্থাৎ পথভ্রষ্ট) ছিল পরে আমি তাকে জীবিত (অর্থাৎ মুসলমান) করেছি এবং তাকে এমন একটি আলোকে (অর্থাৎ ঈমান) দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। (অর্থাৎ আলোকটি সর্বদা তার সাথে থাকে। ফলে সে সব রকম ক্ষতি; যেমন পথভ্রষ্টতা ইত্যাদি থেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত ঘোরাফেরা করে) সে কি (দুরবস্থায়) ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে (পথভ্রষ্টতার) অন্ধকারে (নিমজ্জিত) রয়েছে (এবং) তা থেকে বের হতে (অর্থাৎ মুসলমান হতে) পারছে না? (এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, কুফর অন্ধকার সদৃশ হওয়া সত্ত্বেও সে তা থেকে কেন বের হয় না। কারণ এই যে, মু'মিনদের কাছে যেমন তাদের ঈমান ভাল মনে হয়।) তেমনিভাবে কাফিরদের দৃষ্টিতেও তাদের কাজকর্ম (কুফর ইত্যাদি) সুশোভিত মনে হয়। (এ কারণেই মক্কার কাফিররা---যারা আপনার কাছে অনর্থক দাবী-দাওয়া, সন্দেহ ও তর্ক-বিতর্ক উত্থাপন করে, তারা স্বীয় কুফরকে সুশোভিত মনে করেই তাতে অবিচল রয়েছে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে উল্লিখিত হয়েছিল যে, ইসলামের শত্রুরা রসূলুল্লাহ্ (সা)

ও কোরআন পাকের খোলাখুলি মো'জেযা দেখা সত্ত্বেও জেদ ও হঠকারিতাবশত নতুন নতুন মো'জেযা দাবী করে। অতঃপর কোরআন ব্যক্ত করেছে যে, যদি তারা বাস্তবিকই সত্যান্বেষী হত, তবে এ যাবত যেসব মো'জেযা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য পর্যাপ্তের চাইতেও বেশী ছিল। অতঃপর সেসব মো'জেযা বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও কোরআনে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের কিছু অবস্থা, চিন্তাধারা, উভয়ের সু ও কুপরিণামের বর্ণনা, মু'মিন ও কাফির এবং ঈমান ও কুফরের স্বরূপ উদাহরণের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। মু'মিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত দ্বারা এবং ঈমান ও কুফরের দৃষ্টান্ত আলোক ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া হয়েছে। এগুলো কোরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত। এগুলোতে কবিত্ব নেই--আছে সত্যের উদ্‌ঘাটন।

মু'মিন জীবিত আর কাফির মৃত ঃ এ দৃষ্টান্তে মু'মিনকে জীবিত এবং কাফিরকে মৃত বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদ ইত্যাদির মধ্যে জীবনের প্রকার ও রূপরেখা যদিও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু বিষয়টি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না যে, এদের মধ্যে প্রত্যেকের জীবনই কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত। প্রকৃতি প্রত্যেকের মধ্যে সে লক্ষ্য অর্জনের যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নিহিত রেখেছে ঃ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ---কোরআনের এ বাক্যে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব জাহানের প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে অভীষ্ট লক্ষ্য পর্যন্ত পৌঁছার জন্য পূর্ণরূপে পথ প্রদর্শন করেছেন। এ পথ প্রদর্শন অনুযায়ী প্রত্যেক সৃষ্ট জীব নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে তা পালন করে যাচ্ছে। কর্তব্য পালনই তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রমাণ। এদের মধ্যে যে বস্তু যখন যে অবস্থায় স্বীয় কর্তব্য পালন ত্যাগ করে, তখন সে জীবিত নয়---মৃত। পানি যদি স্বীয় কর্তব্য পিপাসা নিবারণ ও ময়লা নিষ্কাশন ইত্যাদি ছেড়ে দেয় তবে তাকে পানি বলা যায় না। আগুন জ্বালানো-পোড়ানো ছেড়ে দিলে আগুন থাকবে না। বৃক্ষ ও ঘাস উৎপন্ন হওয়া, বেড়ে ওঠা অতঃপর ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ হওয়া ত্যাগ করলে বৃক্ষ ও উদ্ভিদ থাকবে না। কেননা, সে স্বীয় জীবনের লক্ষ্যকে ত্যাগ করেছে। ফলে সে নিষ্প্রাণ মৃতের মত হয়ে গেছে।

সমগ্র সৃষ্ট জগতের বিস্তারিত পর্যালোচনা করার পর সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিও এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য হবে যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? সে যদি স্বীয় জীবনের লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, তবে সে জীবিত বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। নতুবা তার স্বরূপ একটি মৃতদেহের চাইতে বেশী কিছু নয়।

এখন দেখতে হবে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য কি? উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী একথা সুনির্দিষ্ট যে, সে যদি জীবনের লক্ষ্য ও কর্তব্য পালন করে যায়, তবে সে জীবিত নতুবা মৃত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। যেসব জ্ঞানপাপী পণ্ডিত মানুষকে জগতের

একটি স্বউদ্‌গত ঘাস কিংবা একটি চালাক ধরনের জন্তু বলে সাব্যস্ত করেছে, যাদের মতে মানুষ ও গাধার মধ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য নেই এবং যারা মানবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ এবং অবশেষে মরে যাওয়াকেই জীবনের লক্ষ্য হিসাবে স্থির করেছে, তারা প্রকৃত জ্ঞানীদের কাছে সম্বোধনের যোগ্য নয়। বিশ্বের প্রত্যেক ধর্ম ও চিন্তাধারার সাথে সম্পর্কশীল মনীষীবৃন্দ সৃষ্টির আদিকাল থেকে অদ্যাবধি এ বিষয়ে একমত যে, মানুষ সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মখলুকাত। এটা জানা কথা যে, যার জীবনের লক্ষ্য সেরা ও উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী, তাকেই সেরা ও উত্তম বলা যেতে পারে। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথাও জানে যে, পানাহার, নিদ্রা-জাগরণ, বসবাস ও পরিধানের ব্যাপারে অন্যান্য জীব-জন্তুর চাইতে মানুষের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। বরং অনেক জীবজন্তু মানুষের চাইতে উত্তম ও বেশী পানাহার করে, মানুষের চাইতে ভাল প্রাকৃতিক পোশাক পরিবৃত এবং মানুষের চাইতে উৎকৃষ্ট আলো-বাতাসে বসবাস করে। নিজের লাভ-লোকসান চেনার ব্যাপারে প্রত্যেক জন্তু বরং প্রত্যেক উদ্ভিদ বেশ সচেতন। উপকারী বস্তু অর্জন এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে আত্মরক্ষার যথেষ্ট যোগ্যতা তারা রাখে। এমনি-ভাবে অপরের উপকার সাধনের ব্যাপারে তো সকল জীবজন্তু ও উদ্ভিদ বাহ্যত মানুষের চাইতেও অগ্রে। তাদের মাংস, চামড়া, অস্থি, রগ এবং বৃক্ষের শিকড় থেকে নিয়ে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পল্লব পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু সৃষ্ট জীবের জন্য উপকারী। পক্ষান্তরে মানুষের মাংস, চামড়া, লোম, অস্থি, রগ ইত্যাদি কোন কাজেই আসে না।

এখন দেখতে হবে, এমতাবস্থায় মানুষ কিসের ভিত্তিতে 'সৃষ্টির' সেরা পদে অভিষিক্ত হয়েছে? সত্যোপলব্ধির মনযিল এবার কাছেই এসে গেছে। সামান্য চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, উপরোক্ত বস্তুসমূহের বুদ্ধি ও চেতনার দৌড় উপস্থিত জীবনের সাময়িক লাভ-লোকসান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। এ জীবনেই এগুলো অপরের জন্য উপকারী দেখা যায়। পার্থিব জীবনের পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি হবে--এ ক্ষেত্রে জড় পদার্থ ও উদ্ভিদের তো কথাই নেই, কোন বৃহত্তম হুঁশিয়ার জন্তুর জ্ঞানচেতনাও কাজ করে না এবং এ ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কোন বস্তুই কারও উপকারে আসে না। ব্যস, এক্ষেত্রেই সৃষ্টির সেরা মানুষকে কাজ করতে হবে এবং এর দ্বারাই অন্যান্য সৃষ্ট জীব থেকে তার স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হতে পারে।

জানা গেল যে, মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের আদি-অন্তকে সামনে রেখে সবার পরিণাম চিন্তা করে এটা নির্ধারণ করা যে, সামগ্রিক দিক দিয়ে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন্ বস্তু ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক। অতঃপর এ জ্ঞানের আলোতে নিজের জন্য উপকারী বস্তুসমূহ অর্জন করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা; অপরকে এসব উপকারী বস্তুসমূহের প্রতি আহবান করা এবং ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হওয়া যাতে চিরস্থায়ী সুখ, আরাম ও শান্তির জীবন অর্জিত হয়। যখন মানব জীবনের লক্ষ্য এবং মানবিক পূর্ণতার এ আদর্শগত উপকার নিজেকে অর্জন করতে হবে এবং অপরকে পৌঁছাতে হবে তখন কোরআনে এ দৃষ্টান্ত বাস্তব রূপ ধারণ করে ফুটে উঠবে যে, ঐ ব্যক্তিই জীবিত যে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বের আদিঅন্ত ও এর সামগ্রিক লাভ-লোকসানকে আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের আলোকে যাচাই করে। কেননা,

নিছক মানবিক জ্ঞান-বুদ্ধি কখনও এ কাজ করেনি এবং করতে পারেও না। বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিত ও দার্শনিক অবশেষে একথা স্বীকার করেছেন। মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন ঃ

زیر کانِ موشگا فانِ دھی
کردہ ھر خرطوم خط الٰہی

আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশের অনুসারী ও মু'মিন ব্যক্তিই যখন জীবনের লক্ষ্যের দিক দিয়ে জীবিত, তখন একথাও বোঝা গেল, যে ব্যক্তি এরূপ নয়, সে মৃত বলেই অভিহিত হওয়ার যোগ্য। মওলানা রুমীর ভাষায় জীবনের লক্ষ্য হল ঃ

زندگی از بہر طاعت و بندگی است
بے عبادت زندگی شرمندگی ست
آدمیت لحم وشحم وپوست نیست
آدمیت جز رضائے دوست نیست

এটি ছিল মু'মিন ও কাফিরের কোরআন বর্ণিত দৃষ্টান্ত। মু'মিন জীবিত আর কাফির মৃত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ঈমান ও কুফরের আলো ও অন্ধকার দ্বারা দেওয়া হয়েছে।

ঈমান আলো ও কুফর অন্ধকার ঃ ঈমানকে আলো এবং কুফরকে অন্ধকার বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বোঝা যায়, এ দৃষ্টান্তটি মোটেই কাল্পনিক নয়---বাস্তব সত্যেরই বর্ণনা। আলো ও অন্ধকারের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করলে দৃষ্টান্তের স্বরূপ ফুটে উঠবে। আলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিকট ও দূরের বস্তুসমূহ দেখা, যার ফলে ক্ষতিকর বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকা এবং উপকারী বস্তুসমূহকে অবলম্বন করার সুযোগ পাওয়া যায়।

এখন ঈমানকে দেখুন। সেটি একটি নূর, যার আলো সমগ্র আকাশ, ভূপৃষ্ঠ এবং এগুলোর বাইরের সব বস্তুতে প্রতিফলিত। একমাত্র এ আলোই গোটা বিশ্বের পরিণাম এবং সবকিছুর বিশুদ্ধ ফলাফল দেখাতে পারে ঃ যার কাছে এ নূর থাকে, সে নিজেও সব ক্ষতিকর বস্তু থেকে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে। পক্ষান্তরে যার কাছে এ আলো নেই, সে নিজে অন্ধকারে নিমজ্জিত। সামগ্রিক বিশ্ব এবং গোটা জীবনের দিক দিয়ে কোন্ বস্তু উপকারী এবং কোন্ বস্তু অপকারী সে তা বাছাই করতে পারে না। শুধু হাতের কাছের বস্তুসমূহকে অনুমান করে কিছু চিনতে পারে। ইহকালীন জীবনই হচ্ছে হাতের কাছের পরিবেশ। কাফির ব্যক্তি পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী এ জীবন এবং এর লাভ-লোকসান চিনে নেয়। কিন্তু পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের কোন খবরই সে রাখে না। এ জীবনের লাভ-লোকসানের কোন অনুভূতিও তার নেই। কোরআন পাক এ বিষয়টি বোঝাবার জন্যই বলেছে ঃ

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

অর্থাৎ তারা বাহ্যিক পার্থিব জীবন এবং এর লাভ-লোকসান যৎসামান্য বুঝে, কিন্তু **পরকাল সম্পর্কে** এরা একেবারেই গাফিল।

অন্য এক আয়াতে পূর্ববর্তী কাফির সম্প্রদায়সমূহের কথা উল্লেখ করার পর কোরআন বলে ঃ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ —অর্থাৎ পরকালের ব্যাপারে এমন তীব্র গাফিল ব্যক্তিরা এ জগতে বোকা ও নির্বোধ ছিল না; বরং তারা ছিল উর্বর মস্তিষ্ক ও প্রগতিবাদী। কিন্তু এ বাহ্যিক চিন্তার ঔজ্জ্বল্য শুধু জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরিপাটিতেই কাজে লাগতে পারত। পরকালের চিরস্থায়ী জীবনে এর কোন প্রভাব ছিল না।

এ বিবরণ শোনার পর আলোচ্য আয়াতটি পুনরায় পাঠ করুন ঃ

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ـ

উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি পূর্বে মৃত অর্থাৎ কাফির ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি অর্থাৎ মুসলমান করেছি এবং তাকে এমন একটি নূর অর্থাৎ ঈমান দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যার অবস্থা এই যে, সে এমন অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে বের হতে পারে না। অর্থাৎ কুফরের অন্ধকারসমূহে পতিত। সে নিজেই নিজের লাভ-লোকসান চেনে না, অপরের কি উপকার করবে।

ঈমানের আলোর উপকার অন্যেরাও পায় ঃ এ আয়াতে نُورًا يَمْشِي بِهِ বলে একথাও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ঈমানের আলো শুধু মসজিদ, খানকাহ্, নির্জন প্রকোষ্ঠ কিংবা হুজরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ নূর প্রাপ্ত হয়, সে একে নিয়ে জনসমাবেশে চলাফেরা করে এবং সর্বত্র এর দ্বারা নিজেও উপকৃত হয় এবং অপরকেও উপকার পৌঁছায়। আলো কোন অন্ধকারের কাছে পরাভূত হয় না। একটি মিটিমিটি প্রদীপও অন্ধকারে নতি স্বীকার করে না, তবে প্রদীপের আলো দূর পর্যন্ত পৌঁছে না। কিরণ প্রখর হলে দূরে পৌঁছে এবং নিস্তেজ হলে অল্প স্থান আলোকিত করে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই সে অন্ধকার ভেদ করে। অন্ধকার তাকে ভেদ করতে পারে না। অন্ধকার যে আলোকে ভেদ করে, সে আলোই নয়। এমনিভাবে যে ঈমান কুফরের কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তা ঈমানই নয়। ঈমানের নূর মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্বাবস্থায় ও সর্বযুগে মানুষের সাথে আছে।

এমনিভাবে এ দৃষ্টান্তে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোর উপকারিতা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় কিছু না কিছু ভোগ করে। মনে করুন, আলোর মালিক চায় না যে, অন্য কেউ এ আলোর দ্বারা উপকৃত হোক এবং অপর ব্যক্তিও উপকার লাভের ইচ্ছা করেনি, কিন্তু কারো সাথে আলো থাকলে অনিচ্ছায় ও স্বাভাবিকভাবে সবাই

তা দ্বারা উপকৃত হবে। এমনিভাবে মু'মিনের ঈমান দ্বারা অন্যরাও কিছু-না-কিছু উপকার লাভ করে, সে অনুভব করুক বা না করুক। আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ অর্থাৎ এসব স্পষ্ট ও খোলাখুলি প্রমাণ সত্ত্বেও কাফিরদের কুফরে অটল থাকার কারণ এই যে, هر كس بخيال خويش خبطے دارد (প্রত্যেকেই নিজ ধারণায় একটা না একটা বাতিক পোষণ করে)। শয়তান ও মানসিক প্রবৃত্তি তাদের মন্দ কাজকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে রেখেছে—এটা মারাত্মক বিভ্রান্তি। ---(নাউযুবিল্লাহ মিনহু)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ اَكٰبِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ۭ وَمَا يَمْكُرُوْنَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝ وَاِذَا جَاۗءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ ۘ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ۭ سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ ۝ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ ۚ وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاۗءِ ۭ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

(১২৩) আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি---যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (১২৪) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, তখন বলে ঃ আমরা কখনই মানব না, যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা আল্লাহ্‌র রসূলগণ প্রদত্ত হয়েছেন। আল্লাহ্ এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। যারা অপরাধ করছে, তারা অতি সত্বর আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে লাঞ্ছনা ও কঠোর শাস্তি পাবে, তাদের চক্রান্তের কারণে। (১২৫) অতঃপর আল্লাহ্ যাকে পথপ্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে সংকীর্ণ—অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন—যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর আযাব বর্ষণ করেন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এটা কোন নতুন বিষয় নয় ; মক্কার সর্দাররা যেমন এসব অপরাধ করে যাচ্ছে এবং তাদের প্রভাবে অন্যরাও এতে সায় দিচ্ছে) এমনিভাবে আমি (পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও) প্রত্যেক জনপদে সেখানকার সর্দারদের (প্রথমে) অপরাধকারী করেছি, (এরপর তাদের প্রভাবে জনগণও তাদের সাথে হাত মিলিয়েছে) যাতে তারা সেখানে (পয়গম্বরদের ক্ষতি করার জন্য) চক্রান্ত করে। (ফলে তাদের শাস্তিযোগ্য হওয়ার বিষয়টি দিবালোকের মত প্রকটিত হয়ে যায়।) এবং তারা (নিজ ধারণায় অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও বাস্তবে) নিজেদের সাথেই চক্রান্ত করছে। (কেননা, এর শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে হবে।) আর (চূড়ান্ত মূর্খতার কারণে) তারা (এর) কিছুই খবর রাখে না। (কাফিরদের অপরাধ এতই বেড়ে গেছে যে,) যখন তাদের কাছে কোন আয়াত পৌঁছে, (স্বীয় অলৌকিকতার কারণে তা নবুয়ত সপ্রমাণে যথেষ্ট হলেও তারা) তখন বলে ঃ আমরা (এ নবীর প্রতি) কখনই বিশ্বাস স্থাপন করব না, যে পর্যন্ত না আমরাও তা প্রদত্ত হই, যা (অর্থাৎ যেসব প্রত্যাদেশ, সম্বোধন কিংবা ঐশী গ্রন্থ) আল্লাহ্‌র রসূলরা প্রাপ্ত হন। (যাতে আমাদের পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নির্দেশ থাকবে। তাদের এ উক্তি যে বিরাট অপরাধ, তা বলাই বাহুল্য। কেননা, মিথ্যারোপ, হঠকারিতা, অহংকার, ধৃষ্টতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা এ উক্তি খণ্ডন করে বলেন,) আল্লাহ্ তা'আলাই এ বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত যে, কোথায় (ওহী সহকারে) স্বীয় পয়গাম প্রেরণ করতে হবে। (সবাই কি এ গৌরব লাভের যোগ্য হয়েছে ঃ تا نبخشد خدائے بخشنده — যে পর্যন্ত দাতা আল্লাহ্ দান না করেন ?) অতঃপর (এ অপরাধের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে যে,) যারা এ অপরাধ করছে অতি সত্বর তারা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে (অর্থাৎ পরকালে) লাঞ্ছনা ভোগ করবে (যেমন তারা নিজেদের নবীর মোকাবিলায় সম্মান ও নবুয়তের যোগ্য মনে করেছিল)। কঠোর শাস্তি (পাবে) তাদের চক্রান্তের কারণে, অতএব, (পূর্বে মু'মিন ও কাফিরের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে জানা গেল যে) আল্লাহ্ যাকে (মুক্তির) পথপ্রদর্শন করতে ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে (অর্থাৎ অন্তরকে) ইসলামের জন্য (অর্থাৎ ইসলাম কবুল করার জন্য) উন্মুক্ত করে দেন (ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করতে ইতস্তত করে না। এটাই পূর্বোল্লিখিত নূর।) এবং যাকে (সৃষ্টিগত ও বিধিগতভাবে) বিপথগামী রাখতে ইচ্ছা করেন, তার বক্ষকে (অর্থাৎ অন্তরকে ইসলাম গ্রহণ করার ব্যাপারে) সংকীর্ণ (এবং) অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন, (ইসলাম গ্রহণ করা তার কাছে এমন কঠিন বিপদ বলে মনে হয়, যেন) আকাশে আরোহণ করে। (অর্থাৎ আকাশে আরোহণ করতে চায়, কিন্তু করতে পারে না ! ফলে বিরক্তিবোধ করে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়। সুতরাং এ ব্যক্তি যেমন আরোহণ করতে পারে না) এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, আল্লাহ্ তাদের উপর (যেহেতু তাদের কুফর ও চক্রান্তের কারণে) অভিশাপ নিক্ষেপ করেন (তাই তাঁরা বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হয় না)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছিল যে, এ জগত একটি পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানে

সৎকর্মের সাথে যেমন কিছু পরিশ্রম, কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি রয়েছে ; তেমনি মন্দ কর্মের সাথে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ এবং কামনা-বাসনার ধোঁকা সংযুক্ত রয়েছে। এ ধোঁকা পরিণাম-দর্শী মানুষের দৃষ্টিতে তাদের মন্দ কাজকেই সুশোভিত করে রাখে। জগতের অনেক চতুর ব্যক্তিও এ ধোঁকায় লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথমটিতে বর্ণিত হয়েছে যে, এটাও এ পরীক্ষারই এক পিঠ যে, পৃথিবীর আদিকাল থেকে প্রত্যেক জনপদের সর্দার ও ধনী ব্যক্তিরাই বাস্তব সত্য ও পরিণাম ফল থেকে উদাসীন হয়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দে বিভোর হয়ে অপরাধ করে থাকে এবং জনসাধারণ বড় লোকদের পেছনে চলা এবং তাদের অনুসরণ করাকেই সৌভাগ্য ও সাফল্য গণ্য করে। আম্বিয়া (আ) ও তাঁদের নায়েব আলিম ও মাশায়েখরা তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং পরিণামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইলে বড় লোকেরা তাঁদের বিরুদ্ধে নানারকম চক্রান্ত করে। এসব চক্রান্ত বাহ্যত পয়গম্বর, আলিম ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে হলেও পরিণামের দিক দিয়ে এগুলোর শাস্তি স্বয়ং তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং প্রায়শ দুনিয়াতেও তা প্রকাশ পায়।

এতে মুসলমানদের হুঁশিয়ার করা হয়েছে যাতে তারা বড়লোক ও ধনীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, যেন তাদের পেছনে চলার অভ্যাস না করে, যেন পরিণামদর্শিতা অবলম্বন করে এবং ভালমন্দ যেন নিজেই চিনে নেয়।

এছাড়া আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কোরায়েশ সর্দারদের বিরুদ্ধাচরণে আপনি মনঃক্ষুণ্ণ হবেন না। এটা নতুন ঘটনা নয়। পূর্ববর্তী পয়গম্বরদেরও এ ধরনের লোকের সাথে পালা পড়েছে। পরিণামে এরা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং আল্লাহ্র বাণী সমুন্নত হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে কোরায়েশ সর্দারদের একটি সংলাপ উল্লেখ করা হয়েছে। হঠকারিতা, বিদ্রূপ ও পরিহাসের ভঙ্গিতে তারা এসব কথাবার্তা বলেছিল। এরপর তার উত্তর দেওয়া হয়েছে।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন যে, কোরায়েশ প্রধান আবূ জাহ্ল একবার বলল যে, যে আবদে মনাফ গোত্রের [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র গোত্রের] সাথে আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা করেছি এবং কখনও পেছনে পড়িনি। কিন্তু এখন তারা বলে ঃ তোমরা ভদ্রতা ও শ্রেষ্ঠত্বে আমাদের সমতুল্য হতে পারবে না। আমাদের পরিবারে একজন নবী আগমন করেছেন। তাঁর কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ওহী আসে। আবূ জাহল বলল ঃ আল্লাহ্র কসম, আমরা কোনদিনই তাদের অনুসরণ করব না, যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে তাদের অনুরূপ ওহী আসে। আয়াত وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ এর মর্মার্থ তাই-ই।

নবুয়ত সাধনালব্ধ বিষয় নয় বরং আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি মহান পদ ঃ কোরআন পাক এ উক্তি বর্ণনা করার পর জওয়াবে বলেছে ঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ —অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, রিসালত কাকে দান করতে হবে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধেরা মনে করে রেখেছে যে, নবুয়ত বংশগত আভিজাত্য কিংবা গোত্রীয় সর্দারী ও ধনাঢ্যতার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। অথচ নবুয়ত হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতিনিধিত্বের একটি পদ। এটা অর্জন করা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত। হাজারো গুণ অর্জন করার পরও কেউ স্বেচ্ছায় অথবা গুণের জোরে রিসালত অর্জন করতে পারে না। এটা খাঁটি আল্লাহ্র দান। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।

এতে প্রমাণিত হয় যে, রিসালত ও নবুয়ত উপার্জন করার বস্তু নয় যে, জ্ঞানগত ও কর্মগত গুণাবলী অথবা সাধনা ইত্যাদি দ্বারা অর্জন করা যাবে। আল্লাহ্র বন্ধুত্বের সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেও কেউ নবুয়ত লাভ করতে পারে না। বরং আল্লাহ্র এ খাঁটি অনুগ্রহ আল্লাহ্র জ্ঞান ও রহস্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বান্দাকে দান করা হয়। তবে এটা জরুরী যে, আল্লাহ্ যাকে এ পদমর্যাদা দিতে ইচ্ছা করেন তাকে প্রথম থেকেই এর জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়, তাঁর চরিত্র ও কাজকর্ম বিশেষভাবে গঠন করা হয়।

আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا كَانُوْا يَمْكُرُوْنَ -

এখানে صغار শব্দটি একটি ধাতু। এর অর্থ অপমান ও লাঞ্ছনা। এ বাক্যের অর্থ এই যে, সত্যের যেসব শত্রু আজ স্বগোত্র সর্দার ও বড় লোক খেতাবে ভূষিত, অতি সত্বর তাদের বড়ত্ব ও সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত হবে। আল্লাহ্র কাছে তারা তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করবে এবং কঠোর শাস্তিতে পতিত হবে।

'আল্লাহ্র কাছে'—এর এক অর্থ এই যে, কিয়ামতের দিন যখন তারা আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হবে, তখন অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় উপস্থিত হবে। অতঃপর তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। দ্বিতীয় অর্থ এটাও হতে পারে যে, বর্তমানে বাহ্যত তারা সর্দার ও সম্মানিত হলেও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদেরকে তীব্র অপমান ও লাঞ্ছনা স্পর্শ করবে। এমনটি দুনিয়াতেও হতে পারে এবং পরকালেও। যেমন পয়গম্বরদের শত্রুদের ব্যাপারে জগতের ইতিহাসে এরূপ হতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাঁদের শত্রুরা পরিণামে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর বড় বড় শত্রু, যারা নিজেরা সম্মানিত বলে খুব আস্ফালন করত, তারা একে একে হয় ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে, না হয় অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় ধ্বংস হয়ে গেছে। আবূ জাহ্ল, আবূ লাহাব প্রমুখ কোরায়েশ সর্দারের

শোচনীয় অবস্থা বিশ্বাসীদের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। মক্কা বিজয়ের ঘটনা তাদের সবার কোমর ভেঙে দেয়।

দীন সম্পর্কে অন্তর খুলে দেওয়া এবং এর লক্ষণাদি ঃ তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হিদায়ত প্রাপ্ত এবং পথভ্রষ্টতায় অটল ব্যক্তিদের কিছু চিহ্ন ও লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়ত দিতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে شرح صدر অর্থাৎ অন্তর খুলে দেওয়ার তফসীর জিজ্ঞেস করেন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনের অন্তরে একটি আলো সৃষ্টি করে দেন। ফলে তার অন্তর সত্যকে নিরীক্ষণ করা, হৃদয়ঙ্গম করা এবং গ্রহণ করার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় (সত্যকে সহজে গ্রহণ করতে শুরু করে এবং অসত্যকে ঘৃণা করতে থাকে)। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ এরূপ ব্যক্তিকে চেনার মত কোন লক্ষণ আছে কি ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, লক্ষণ এই যে, এরূপ ব্যক্তির সমগ্র আশা-আকাঙ্ক্ষা পরকাল ও পরকালের নিয়ামতের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। সে পার্থিব অন্যায় কামনা-বাসনা এবং ধ্বংসশীল আনন্দ-উল্লাস থেকে বিরত থাকে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। অতঃপর বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ اَنْ يُّضِلَّهٗ يَجْعَلْ صَدْرَهٗ ضَيِّقًا حَرَجًا كَاَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى السَّمَآءِ

অর্থাৎ যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্টতায় রাখতে চান, তার অন্তর সংকীর্ণ এবং অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন। সত্যকে গ্রহণ করা এবং তদনুযায়ী কাজ করা তার কাছে এমন কঠিন মনে হয়, যেমন কারও আকাশে আরোহণ করা।

তফসীরবিদ কলবী বলেন ঃ তার অন্তর সংকীর্ণ হওয়ার অর্থ এই যে, তাতে সত্য ও সৎকর্মের জন্য কোন পথ থাকে না। হযরত ফারূকে আযম (রা) থেকেও এ বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র যিকির থেকে তার মন বিমুখ থাকে এবং কুফর ও শিরকের কথা-বার্তায় নিবিষ্ট হয়।

সাহাবায়ে কিরাম দীনের ব্যাপারে উন্মুক্ত অন্তর ছিলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামকে স্বীয় রসূলের সংসর্গ এবং প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বের জন্য মনোনীত করেছিলেন। ইসলামী বিধি-বিধানে তাঁরা খুব কমই সন্দেহ ও সংশয়ের সম্মুখীন হতেন। তাঁরা সারা জীবনে যেসব প্রশ্ন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উত্থাপন করেন, সেগুলো গুণাগুনতি কয়েকটি মাত্র। কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র সংসর্গের কল্যাণে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা তাঁদের অন্তরে

সুগভীর রেখাপাত করেছিল। ফলে তাঁরা شرح صدر তথা বক্ষ উন্মুক্তকরণের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁদের অন্তর আপনা থেকেই সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা সত্যকে অতি সহজে কালবিলম্ব না করে গ্রহণ করে নিতেন এবং অসত্য তাঁদের অন্তরে পথ খুঁজে পেতো না। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র যুগ থেকে যতই দূরত্ব বাড়তে থাকে, সন্দেহ ও সংশয় ততই অন্তরে রাস্তা পেতে থাকে এবং বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে।

সন্দেহ দূর করার প্রকৃত পন্থা ঃ আজ সমগ্র বিশ্ব এসব সন্দেহ ও সংশয়ের আবর্তে নিপতিত। তারা তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে এর মীমাংসা করতে সচেষ্ট। অথচ এটা এর নির্ভুল পথ নয়।

فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں
ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں

দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের মধ্যে আল্লাহ্কে পায় না। সে সূতা ভাঁজ করে, কিন্তু সূতার মাথা খুঁজে পায় না।

সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী মনীষীবৃন্দ যে পথ ধরেছিলেন, সেটাই ছিল যথার্থ পথ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ শক্তি ও নিয়ামত কল্পনায় উপস্থিত করে অন্তরে তাঁর মাহাত্ম্য ও ভালবাসা সৃষ্টি করলে সন্দেহ-সংশয় আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। এ কারণেই কোরআন পাক রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এ দোয়া করার আদেশ দিয়েছে ঃ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দাও।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে সত্য আসন পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে সোল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ ﴿١٢٦﴾
لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ
يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِّنَ الْاِنْسِ ۚ وَقَالَ

أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٢٧﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨﴾

(১২৬) আর এটাই আপনার পালনকর্তার সরল পথ। আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহ পুংখানুপুংখ বর্ণনা করেছি। (১২৭) তাদের জন্যই তাদের পালনকর্তার কাছে নিরাপদ গৃহ রয়েছে এবং তিনি তাদের বন্ধু, তাদের কর্মের কারণে। (১২৮) যেদিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্র করবেন, হে জ্বিন সম্প্রদায়, তোমরা লোকদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পর পরস্পরের মাধ্যমে ফল লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেনঃ আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ্। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (পূর্বে যে ইসলামের কথা বলা হয়েছে,) এটাই (অর্থাৎ এ ইসলামই) আপনার পালনকর্তার (বর্ণিত) সরল পথ। (এ পথে চললেই মুক্তি পাওয়া যায়। এরই উল্লেখ রয়েছে فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ বাক্যে। এ সরল পথের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে) আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহ পুংখানুপুংখ (-ভাবে) বর্ণনা করেছি (যাতে তারা এর অলৌকিকতা দৃষ্টে একে সত্য মনে করে এর বিষয়বস্তু বাস্তবায়িত করে মুক্তি লাভ করে। এ সত্য মনে করা এবং তদনুযায়ী কাজ করাই পূর্ণ সরল পথ। কিন্তু যারা উপদেশ গ্রহণের চিন্তাই করে না, তাদের জন্য এটিও যথেষ্ট নয় এবং অন্য প্রমাণাদিও যথেষ্ট নয়। অতঃপর উপদেশ গ্রহণকারীদের প্রতিদান বর্ণনা করা হয়েছে; যেমন এর আগে একাধিক বাক্যে অমান্যকারীদের শাস্তি উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছেঃ) তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার নিকট (পৌঁছে) নিরাপদ (অর্থাৎ শান্তি ও স্থায়িত্বের) আশ্রয় (অর্থাৎ জান্নাত) রয়েছে এবং আল্লাহ্ তাদের বন্ধু তাদের (সৎ) কর্মের কারণে। আর (ঐ দিনটিও স্মরণযোগ্য) যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা সবাইকে একত্র করবেন (এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে শয়তান জ্বিন, কাফিরদের উপস্থিত করে শাসিয়ে বলা হবে ঃ) হে জ্বিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের (অর্থাৎ তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার) ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছ (এবং তাদের পদে পদে বিভ্রান্ত করেছ। এমনিভাবে মানুষদের জিজ্ঞেস

করা হবে ঃ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ মোটকথা শয়তান-

জিনেরাও স্বীকার করবে) এবং যেসব লোক তাদের (শয়তান-জিনদের) বন্ধু, তারা (-ও) বলবে ঃ হে আমাদের পালনকর্তা (আপনি ঠিকই বলেছেন, বাস্তবিকই) আমরা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা (এ পথভ্রষ্টতার কাজে মানসিক) ফললাভ করেছিলাম। (পথভ্রান্ত মানুষ স্বীয় কুফর ও শিরকের বিশ্বাসে আনন্দ পায় এবং পথভ্রষ্টকারী শয়তানরা নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে প্রশান্তি লাভ করে।) এবং (প্রকৃতপক্ষে আমরাও কিয়ামতে অবিশ্বাসী ছিলাম। তাই তাদের পথভ্রষ্ট করেছিলাম। কিন্তু আমাদের এ অবিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। সেমতে) আপনি আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা সেই নির্ধারিত সময়ে উপনীত হয়েছি (অর্থাৎ কিয়ামত এসে গেছে।) আল্লাহ্ তা'আলা (সব জিন ও মানব কাফিরদের) বলবেন ঃ তোমাদের বাসস্থান হল দোযখ, সেখানে তোমরা সর্বদা অবস্থান করবে। (নিষ্কৃতির কোন পথ ও উপায় নেই।) কিন্তু যদি আল্লাহ্ (বের করতে) চান, তবে ভিন্ন কথা। (অবশ্য এটা নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা তা চাইবেন না। অতএব চিরকাল এতেই থাকবে।) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (তিনি জ্ঞানের মাধ্যমে সবার অপরাধ জেনে নেন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপযুক্ত শাস্তি দেন।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا অর্থাৎ এটা আপনার পালনকর্তার সরল পথ। এখানে (এটা) শব্দ দ্বারা ইবনে মসউদ (রা)-এর মতে কোরআনের দিকে এবং ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে ইসলামের দিকে ইশারা করা হয়েছে---(রূহুল মা'আনী।) উদ্দেশ্য এই যে, আপনাকে প্রদত্ত কোরআন কিংবা ইসলাম আপনার পালনকর্তার পথ অর্থাৎ এমন পথ, যা আপনার পালনকর্তা স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করেছেন এবং মনোনীত করেছেন। এখানে পথকে পালনকর্তার দিকে সম্পৃক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন ও ইসলামের যে কর্মব্যবস্থা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেওয়া হয়েছে, তা পালন করা আল্লাহ্ তা'আলার উপকারের জন্য নয়, বরং পালনকারীদের উপকারের জন্য পালনকর্তার দাবীর ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে মানুষকে এমন শিক্ষাই দান করা উদ্দেশ্য যা তাদের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে।

এখানে رَبِّكَ শব্দকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র দিকে সম্বন্ধ করে তাঁর প্রতি এমন এক বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপা প্রকাশ করা হয়েছে যার রসাস্বাদ বিশেষ ব্যক্তিরাই অনুভব করতে পারেন। কেননা পালনকর্তা ও উপাস্যের সাথে কোন বান্দার সামান্যতম সম্বন্ধ অর্জিত হয়ে

যাওয়াও তার জন্য পরম গৌরবের বিষয়। তদুপরি যদি পরম পালনকর্তা নিজেকে বান্দার দিকে সম্বন্ধ করে বলেন যে, আমি তোমার, তখন তার সৌভাগ্যের সীমা পরিসীমা থাকে না। হযরত হাসান নিযামী (র) এ স্তরে অবস্থান করে বলেন ঃ

بندہ حسن بصد زبان گفت کہ بندہ تو ام
تو زبانِ خود بگو کہ بندہ نواز کیستی

এরপর مُسْتَقِيْمًا শব্দ দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআনের এ পথই হলো সরল পথ। এখানেও مُسْتَقِيْمًا -কে صراط-এর গুণ হিসেবে উল্লেখ না করে অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিশ্ব পালনকর্তার স্থিরীকৃত পথ মুস্তাকীম ও সরল হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই।—(রূহুল-মা'আনী, বাহরে মুহীত)

এরপর বলা হয়েছে ঃ قَدْ فَصَّلْنَا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ—অর্থাৎ আমি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য আয়াতসমূহকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছি।

فَصَّلْنَا শব্দটি تَفْصِيْل থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ কোন বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে এক এক অধ্যায়কে পৃথক পৃথক করে বিশদভাবে বর্ণনা করা। এভাবে গোটা বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম হয়ে যায়। অতএব تفصيل-এর সারমর্ম হচ্ছে বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা। উদ্দেশ্য এই যে, আমি মৌলিক মাস'আলাগুলোকে পরিষ্কার ও বিশদভাবে বর্ণনা করেছি ; এতে কোন সংক্ষিপ্ততা বা অস্পষ্টতা রাখিনি। এতে لِقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কোরআনের বক্তব্য পুরোপুরি সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার হলেও, তদ্দ্বারা একমাত্র তারাই উপকৃত হয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করে ; জেদ, হঠকারিতা এবং পৈতৃক প্রথার নিশ্চল অনুসরণের প্রাচীর যাদের সামনে অন্তরায় সৃষ্টি করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ لَهُمْ دَارُ السَّلٰمِ عِنْدَ رَبِّهِمْ—অর্থাৎ উপরোক্ত ব্যক্তি, যারা মুক্ত মনে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে কোরআনের পয়গাম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ কোরআনী নির্দেশ মেনে চলে, তাদের জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে 'দারুস-সালাম'-এর পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে 'দার' শব্দের অর্থ গৃহ এবং 'সালাম' শব্দের অর্থ যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা। কাজেই 'দারুস-সালাম' এমন গৃহকে বলা যায়, যেখানে কষ্ট, শ্রম, দুঃখ, বিষাদ, বিপদাপদ ইত্যাদির সমাগম নেই। নিঃসন্দেহে এটা জান্নাতই হতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার একটি নাম। দারুস-সালামের অর্থ আল্লাহ্র গৃহ। আল্লাহ্র গৃহ বলতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্থান বোঝায়। অতএব সার অর্থ আবারও তাই হয় যে, এমন গৃহ যাতে শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি বিদ্যমান। জান্নাতকে দারুস-সালাম বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একমাত্র জান্নাতই এমন জায়গা, যেখানে মানুষ সর্বপ্রকার কষ্ট, উৎকণ্ঠা, উপদ্রব ও স্বভাববিরুদ্ধ বস্তু থেকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে নিরাপদ থাকে। এরূপ নিরাপত্তা জগতে কোন রাজাধিরাজ এবং নবী-রসূলও কখনও লাভ করেন না। কেননা, ধ্বংসশীল জগত এরূপ পরিপূর্ণ ও স্থায়ী শান্তির জায়গাই নয়।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এসব সৌভাগ্যশালীর জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে দারুস-সালাম রয়েছে। 'পালনকর্তার কাছে' এর এক অর্থ এই যে, এ দারুস সালাম ইহজগতে নগদ পাওয়া যায় না। কিয়ামতের দিন যখন তারা স্বীয় পালনকর্তার কাছে যাবে, তখনই তা পাবে! দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দারুস সালামের ওয়াদা ভ্রান্ত হতে পারে না। পালনকর্তা নিজেই এর জামিন। তাঁর কাছে তা সংরক্ষিত রয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দারুস সালামের নিয়ামত ও আরাম আজ কেউ কল্পনাও করতে পারে না। যে পালনকর্তার কাছে এ ভাণ্ডার সংরক্ষিত আছে, তিনিই তা জানেন।

দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে দারুস সালাম লাভ করা কিয়ামত ও পরকালের উপর নির্ভরশীল মনে করা হয় না ; বরং পালনকর্তা যাকে ইচ্ছা এ জগতেও সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা দিয়ে দারুস সালাম দান করতে পারেন। ফলে দুনিয়াতে কোন বিপদাপদই তাকে স্পর্শ করে না। যেমন পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও ওলীগণের মধ্যে এর নজীর দেখতে পাওয়া যায়। অথবা পরকালের নিয়ামত তার সামনে উপস্থিত করে তাঁর দৃষ্টিকে এমন সত্যদর্শী করে দেওয়া হয় যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বিপদাপদ তার দৃষ্টিতে নিতান্ত নগণ্য প্রতিভাত হতে থাকে। বিপদের পাহাড়ও তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারে না।

رنج راحت شد چو مطلب شد بزرگ
گرد گلہ توتیائے چشم گرگ

এ ধরনের লোকদের সামনে দুনিয়ার কষ্টের বিপরীতে পরকালের নিয়ামতসমূহ এমনভাবে উপস্থিত হয় যে, দুনিয়ার কষ্টও তাদের কাছে সুস্বাদু মনে হতে থাকে। এটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। দেখুন, পরকালের নিয়ামত তো অনেক বড় জিনিস, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখের কল্পনা মানুষের কাছে কত পরিশ্রম ও কষ্টকে সুস্বাদু করে দেয়। মানুষ সুপারিশ ও ঘুষ দিয়ে স্বাধীনতার সুখ বিসর্জন দেয় এবং অধীর আগ্রহ সহকারে এমন চাকুরী ও মজুরির শ্রম অন্বেষণ করে, যা তার নিদ্রা ও সুখের পক্ষে কালস্বরূপ। এ মজুরি পেয়ে গেলে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হয়। কেননা তার সামনে ৩০ দিন পূর্ণ হয়ে গেলে যে বেতন পাবে, তার আনন্দ উপস্থিত থাকে। এ আনন্দ চাকুরী ও মজুরির সব তিক্ততাকে সুস্বাদু করে দেয়।

কোরআন পাকের وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ—আয়াতের এক তফসীর এরূপও আছে যে, আল্লাহ্ভীরুরা দু'টি জান্নাত পাবে। একটি পরকালে আর অপরটি

দুনিয়াতে। দুনিয়ার জান্নাত এই যে, প্রথমত, তাদের প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য থাকে। প্রত্যেক কাজ সহজ মনে হতে থাকে এবং কখনও সাময়িক কষ্ট ও অকৃতকার্যতা হলেও পরকালের নিয়ামতের মোকাবেলায় তাও তাদের কাছে সুস্বাদু মনে হয়। ফলে তাও সুখের আকার ধারণ করে।

মোটকথা, এ আয়াতে সৎ লোকের জন্য যে দারুস-সালামের কথা বলা হয়েছে, তা পরকালে তো নিশ্চিত ও অবধারিত ; পরন্তু দুনিয়াতেও তাদেরকে দারুস-সালামের সুখ ও আনন্দ দেওয়া যেতে পারে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ—অর্থাৎ তাদের সৎকর্মের কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী হয়ে যান। তাদের সব মুশকিল আসান হয়ে যায়।

তৃতীয় আয়াতে হাশরের ময়দানে সব জ্বিন ও মানবকে একত্র করার পর উভয় দলের সাথে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা শয়তান জ্বিনদেরকে সম্বোধন করে তাদের অপরাধ ব্যক্ত করবেন এবং বলবেন ঃ তোমরা মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট করার কাজে বিরাট অংশ নিয়েছ। এর উত্তরে জ্বিনরা কি বলবে, কোরআন তা উল্লেখ করেনি। তবে এটা বোঝা যায় যে, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র সামনে স্বীকারোক্তি করা ছাড়া গতি নেই। কিন্তু তাদের স্বীকারোক্তি উল্লেখ না করার মধ্যেই ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ প্রশ্ন শুনে তারা এমন হতবাক হয়ে যাবে যে, উত্তর দেওয়ার জন্য মুখ খুলতে পারবে না। ---(রূহুল-মা'আনী)

এরপর শয়তান মানব অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা শয়তানদের অনুগামী ছিল, নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছে, তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র দরবারে একটি উত্তর বর্ণনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রশ্ন যদিও তাদেরকে করা হয়নি, কিন্তু প্রসঙ্গ-ক্রমে তাদেরকেও যেন সম্বোধন করা হয়েছিল। কেননা, তারাও শয়তান জ্বিনদের কাজ অর্থাৎ পথভ্রষ্টতা প্রচার করেছিল। এ প্রাসঙ্গিক সম্বোধনের কারণে তারা উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যত বোঝা যায় যে, মানবরূপী শয়তানদেরকেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকবে। তা স্পষ্টত এখানে উল্লেখ করা না হলেও সূরা ইয়াসিনের এক আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ অর্থাৎ হে আদম সন্তানরা, আমি কি তোমাদেরকে পয়গম্বরগণের মাধ্যমে বলিনি যে, শয়তানদের অনুসরণ করো না?.

এতে বোঝা যায় যে, এ সময়ে মানুষ শয়তানদেরও প্রশ্ন করা হবে। তারা উত্তরে স্বীকার করবে যে, নিঃসন্দেহে আমরা শয়তানদের কথা মান্য করার অপরাধ করেছি। তারা আরও বলবে ঃ হ্যাঁ, জ্বিন শয়তানরা আমাদের সাথে এবং আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব-পূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ফল লাভ করেছি। মানুষ শয়তানরা তাদের

কাছ থেকে এ ফল লাভ করেছে যে, দুনিয়ার মজা লুটবার উপায়াদি শিক্ষা করেছে এবং কোথাও কোথাও জ্বিন শয়তানদের দোহাই দিয়ে কিংবা অন্য পন্থায় তাদের কাছ থেকে সাহায্যও লাভ করেছে, যেমন মূর্তিপূজারী হিন্দুদের মধ্যে বরং ক্ষেত্র বিশেষে অনেক মূর্খ মুসলমানের মধ্যেও এ পন্থা প্রচলিত আছে, যদ্দ্বারা শয়তান ও জ্বিনদের কাছ থেকে কোন কোন কাজে সাহায্য নেওয়া যায়। জ্বিন শয়তানরা মানুষদের কাছ থেকে যে ফল লাভ করেছে, তা এই যে, তাদের কথা অনুসরণ করা হয়েছে এবং তারা মানুষকে অনুগামী করতে সক্ষম হয়েছে। এমন কি, তারা মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছে। এই মুহূর্তে তারা স্বীকার করবে যে, শয়তানের বিপথগামী করার কারণে আমরা যে মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে গিয়েছিলাম, এখন তা সামনে এসে গেছে। এ স্বীকারোক্তির পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

اَلنَّارُ مَثْوٰكُمْ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۗ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ -

অর্থাৎ তোমরা উভয় দলের অপরাধের শাস্তি এই যে, তোমাদের বাসস্থান হবে অগ্নি, যাতে সদা-সর্বদা থাকবে। তবে আল্লাহ্ কাউকে তা থেকে বের করতে চাইলে তা ভিন্ন কথা। কোরআনের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলাও তা চাইবেন না। তাই অনন্তকালই সেখানে থাকতে হবে।

وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿١٢٩﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۗ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ ﴿١٣٠﴾ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٣٢﴾

(১২৯) এমনিভাবে আমি পাপীদের এককে অপরের সাথে যুক্ত করে দেব তাদের কাজকর্মের কারণে। (১৩০) হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে পয়গম্বররা আগমন করেন নি; যাঁরা তোমাদের আমার বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের আজকের এ দিনের সাক্ষাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন? তারা বলবে ঃ আমরা স্বীয় গোনাহ্ স্বীকার করে নিলাম। পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত

করেছে। তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করে নিয়েছে যে, তারা কাফির ছিল। (১৩১) এটা এ জন্য যে, আপনার পালনকর্তা কোন জনপদের অধিবাসীদের জুলুমের কারণে ধ্বংস করেন না এমতাবস্থায় যে, তথাকার অধিবাসীরা অজ্ঞ থাকে। (১৩২) প্রত্যেকের জন্য তাদের কর্মের আনুপাতিক মর্যাদা আছে এবং আপনার পালনকর্তা তাদের কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (দুনিয়াতে যেভাবে পথভ্রষ্টতার দিক দিয়ে সবার মধ্যে সম্পর্ক ও নৈকট্য ছিল) এমনিভাবে (দোযখে) আমি কতিপয় কাফিরকে কতিপয় কাফিরের নিকটে (-ও) একত্রে রাখব তাদের (কুফরী) কাজকর্মের কারণে। (জ্বিন ও মানবকে তাদের পারস্পরিক অবস্থার দিক দিয়ে এ সম্বোধন করা হয়েছিল। অতঃপর প্রত্যেককে তার বিশেষ ব্যক্তিগত অবস্থার দিক দিয়ে সম্বোধন করা হচ্ছে যে,) হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়, (এবার বল তোমরা যে কুফর ও অস্বীকার করছিলে) তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মধ্য থেকে পয়গম্বর আগমন করেন নি, যাঁরা তোমাদের আমার (বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কিত) বিধানাবলী বর্ণনা করতেন এবং তোমাদের আজকের এ দিনের ভীতি প্রদর্শন করতেন? (অতঃপর কি কারণে তোমরা কুফর থেকে বিরত হওনি?) তারা বলবে ঃ আমরা সবাই নিজেদের বিরুদ্ধে (অপরাধ) স্বীকার করছি। (আমাদের কাছে কোন ওযর ও সাফাই নেই। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপস্থিত বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণ বর্ণনা করে বলেন ঃ) এবং পার্থিব জীবন তাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে (তারা পার্থিব ভোগ-বিলাসকে প্রধান উদ্দেশ্য মনে করে রেখেছে---পরকালের চিন্তাই নেই) এবং (এর পরিণামে সেখানে) তারা নিজেদের বিরুদ্ধে স্বীকার করবে যে, তারা (অর্থাৎ আমরা) কাফির ছিলাম (এবং ভুল করেছিলাম। কিন্তু সেখানে স্বীকার করলে কি হবে? দুনিয়াতে সামান্য মনোযোগী হলে এ অশুভ দিন কি দেখতে হত? পূর্বে পয়গম্বর প্রেরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। অতঃপর পয়গম্বর প্রেরণে আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রকাশ করা হচ্ছে যে) এটা (অর্থাৎ পয়গম্বর প্রেরণ) এ জন্য আপনার পালনকর্তা কোন জনপদের অধিবাসীদের (তাদের) কুফরের কারণে (দুনিয়াতেও) এমতাবস্থায় ধ্বংস করেন না যে, জনপদবাসীরা (পয়গম্বর না আসার কারণে আল্লাহ্র বিধান সম্পর্কে) অজ্ঞাত থাকে। (অতএব পরকালের শাস্তি তো আরও কঠোর। এটা পয়গম্বর প্রেরণ করা ছাড়া কিছুতেই হতে পারত না। তাই আমি পয়গম্বরদের প্রেরণ করি---যাতে তারা অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। এরপর যার শাস্তি হয়, যথা-যোগ্য কারণেই হয়। সেমতে বলা হচ্ছে) এবং (যখন পয়গম্বর আগমন করে এবং তারা অপরাধ জানতে পারে, তখন যে যেরূপ করবে) প্রত্যেকের (জ্বিন , মানব এবং সব অসতের জন্য (শাস্তি ও পুরস্কারের) পদমর্যাদা আছে, তাদের কৃতকর্মের কারণে এবং আপনার পালনকর্তা তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞাত নন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম আয়াত نُوَلِّ শব্দটির আভিধানিক দিক দিয়ে দু'টি অর্থ হতে পারে।

এক. পরস্পরকে যুক্ত করে দেওয়া ও নিকটবর্তী করে দেওয়া এবং দুই. শাসক হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া। তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে উভয় প্রকার অর্থই বর্ণিত আছে।

হাশরে কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে দল গঠিত হবে—জাগতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নয় ঃ হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের, কাতাদাহ্ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ প্রথমোক্ত অর্থে আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মানুষের দল ও পার্টি, বংশ, দেশ কিংবা বর্ণ ও ভাষার ভিত্তিতে হবে না ; বরং কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতে হবে। আল্লাহ্র আনুগত্যশীল মুসলমান যেখানেই থাকবে মুসলমানদের সাথী হবে এবং অবাধ্য কাফির যেখানেই থাকবে, সে কাফিরদের সাথী হবে, তাদের বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও জীবন-যাপন পদ্ধতিতে যতই দূরত্ব ও পার্থক্যই থাকুক না কেন।

এরপর মুসলমানদের মধ্যেও সৎ ও ধার্মিকেরা ধার্মিকদের সাথে থাকবে এবং পাপী ও কুকর্মীদেরকে কুকর্মীদের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হবে। সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ—অর্থাৎ মানবকুলের যুগল ও দল তৈরী করে দেওয়া হবে। এর উদ্দেশ্যও তাই যে, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে হাশরবাসীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।

হযরত ওমর ফারূক (রা) এ আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ সৎ কিংবা অসৎ এক ধরনের আমলকারীদের একত্র করে দেওয়া হবে। সৎ লোকেরা সৎ লোকদের সাথে জান্নাতে এবং অসৎ লোকেরা অসৎদের সাথে জাহান্নামে পৌঁছবে। এ বিষয়বস্তুর সমর্থনে হযরত ওমর (রা) কোরআন পাকের اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করেছেন। এ আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই যে, কিয়ামতের দিন আদেশ হবে ঃ জালিমদের এবং তাদের অনুরূপ আমলকারীদের জাহান্নামে একত্র কর।

আলোচ্য আয়াতের সার-বিষয়বস্তু এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কতক জালিমকে অন্য জালিমদের সাথে যুক্ত করে একদলে পরিণত করে দেবেন---বংশগত ও দেশগতভাবে তাদের মধ্যে যতই দূরত্ব থাক না কেন।

অন্য এক আয়াতে একথাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আজ মানুষের মধ্যে বংশ, দেশ, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যে জাগতিক ও আনুষ্ঠানিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, হাশরের মাঠে তা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বলা হয়েছে ঃ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ — অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত কায়েম হবে, সেদিন পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও ঐকমত্য পোষণকারী ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দুনিয়ার সংঘবদ্ধ কাজ-কারবারে কর্ম ও চরিত্রের প্রভাব ঃ জাগতিক আত্মীয়তা, সম্পর্ক ও আনুষ্ঠানিক সংগঠনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিয়ামতের দিন তো সুস্পষ্টভাবে সবারই দৃষ্টিগোচর হবে, দুনিয়াতেও এর সামান্য নমুনা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এখানে সৎ লোকের সম্পর্ক সৎ লোকদের সাথে স্থাপিত হয় এবং তাদেরই দল ও সমাজের সাথে জড়িত থাকে। ফলে তাদের সামনে সৎকর্মের বিভিন্ন পথ খুলতে থাকে এবং তার সংকল্প দৃঢ় হতে থাকে। এমনিভাবে অসৎ ব্যক্তির সম্পর্ক তার মত অসৎ ব্যক্তিদের সাথেই স্থাপিত হয়। সে তাদের মধ্যে ওঠাবসা করে। তাদের সংসর্গে তার অসৎ কর্ম ও অসচ্চরিত্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সামনে সৎকর্মের দ্বার রুদ্ধ হতে থাকে। এটা তার মন্দকর্মের নগদ সাজা, যা এ দুনিয়াতেই সে পায়।

মোটকথা এই যে, সৎ ও অসৎ কর্মের এক প্রতিদান ও শাস্তি তো পরকালে পাওয়া যাবে এবং এক প্রতিদান ও শাস্তি এ জগতে নগদ পাওয়া যায়। তা এই যে, সৎ ব্যক্তি সৎ সহকর্মী, সৎ ও ধার্মিক সাথী পেয়ে যায়, যারা তার কাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলে। পক্ষান্তরে অসৎ ব্যক্তির সহকর্মীও তার মতই হয়ে থাকে, যারা তাকে আরও গভীর গর্তে ধাক্কা দিয়ে দেয়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন বাদশাহ্ ও শাসনকর্তার প্রতি প্রসন্ন হলে তাকে সৎ মন্ত্রী ও সৎ কর্মচারী দান করেন। ফলে তার রাজ্যের সব কাজ-কর্ম ঠিক-ঠাক ও উন্নত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা কারও প্রতি অপ্রসন্ন হলে সে অসৎ সহকর্মী ও অসৎ কর্মচারী পায়। সে কোন ভাল কাজ করার ইচ্ছা করলেও কুলিয়ে উঠতে পারে না।

এক জালিম অপর জালিমের হাতে শাস্তি ভোগ করে ঃ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা نُوَلِّي শব্দের প্রথমোক্ত অর্থের দিকে দিয়ে বর্ণিত হল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের, ইবনে যায়েদ (রা), মালেক ইবনে দীনার (র) প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে দ্বিতীয় অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের তফসীর এরূপ বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা একজন জালিমকে অপর জালিমের উপর শাসক হিসাবে চাপিয়ে দেন এবং এভাবে এককে অপরের হাতে শাস্তি দেন।

এ বিষয়বস্তুও স্বস্থানে সঠিক ও নির্ভুল এবং কোরআন ও হাদীসের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীল। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ كما تكونون كذالك يؤمر عليكم অর্থাৎ তোমরা যেরূপ হবে তোমাদের উপর তদ্রূপ শাসনকর্তা নিযুক্ত হবে। তোমরা জালিম ও পাপাচারী হলে তোমাদের শাসকবর্গও জালিম এবং পাপাচারীই হবে।

পক্ষান্তরে তোমরা সাধু ও সৎকর্মী হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের শাসনকর্তারূপে সাধু, দয়ালু ও সুবিচারক লোকদের মনোনীত করবেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গল চান, তখন তাদের উপর সর্বোত্তম শাসক নিযুক্ত করেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন কোন সম্প্রদায়ের অমঙ্গল চান, তখন তাদের উপর নিকৃষ্টতম শাসক ও বাদশাহ্ চাপিয়ে দেন এবং তাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দেন।

ইবনে-কাসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদের রেওয়ায়েতক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ উক্তি বর্ণনা করেছেন ঃ من اعان ظالما سلطه الله عليه — অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর অত্যাচারে তাকে সাহায্য করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এ জালিমকেই তার উপর চাপিয়ে দেন। তার হাতেই তাকে শাস্তি দেন।

দ্বিতীয় আয়াতে একটি প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হয়েছে। এ প্রশ্নটি হাশরের ময়দানে জ্বিন ও মানবকে করা হবে। প্রশ্নটি এই ঃ তোমরা কি কারণে কুফর ও আল্লাহ্র অবাধ্যতায় লিপ্ত হলে? তোমাদের কাছে কি আমার পয়গম্বর পৌঁছেনি? সে তো তোমাদের মধ্য থেকেই ছিল এবং আমার আয়াতসমূহ তোমাদের পাঠ করে শোনাত, আজকের দিনের উপস্থিতি এবং হিসাব-কিতাবের ভয় প্রদর্শন করত। এর উত্তরে তাদের সবার পক্ষ থেকে পয়গম্বরদের আগমন, আল্লাহ্র বাণী পৌঁছানো এবং এতদসত্ত্বেও কুফরে লিপ্ত হওয়ার স্বীকারোক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। এ ভ্রান্ত কর্মের কোন কারণ ও হেতু তাদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করা হয়নি, বরং আল্লাহ্ নিজেই এর কারণ বর্ণনা করেছেন যে, وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا অর্থাৎ তাদেরকে পার্থিব জীবন ও ভোগ -বিলাস ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। ফলে তারা একেই সবকিছু মনে করে বসেছে, অথচ এটা প্রকৃতপক্ষে কিছুই নয়। আকবর এলাহাবাদীর ভাষায় ঃ

تھی فقط غفلت ھی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا
ھم اسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا

আলোচ্য আয়াতে প্রথমত প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, অন্য কতিপয় আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের ময়দানে মুশরিকদের কুফর ও শিরক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা মুখ মুছে অস্বীকার করবে এবং পালনকর্তার দরবারে কসম খেয়ে মিথ্যা বলবে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আমাদের পালনকর্তার কসম, আমরা কখনও মুশরিক ছিলাম না। অথচ এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, তারা অনুতাপ সহকারে স্বীয় কুফর ও শিরক

স্বীকার করে নেবে। অতএব আয়াতদ্বয়ের মধ্যে বাহ্যত পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু অন্যান্য আয়াতে এভাবে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রথমে যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে, তখন তারা অস্বীকার করবে। সেমতে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরত বলে তাদের মুখ বন্ধ করে দেবেন। হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য নেবেন। আল্লাহ্র কুদরতে সেগুলো বাকশক্তি প্রাপ্ত হবে। সেগুলো পরিষ্কারভাবে তাদের কুকর্মের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে দেবে। তখন জ্বিন ও মানব জানতে পারবে যে, তাদের হাত, পা, কান, জিহবা সবই ছিল আল্লাহ্র গুপ্ত পুলিশ যারা সব কাজ-কারবার ও অবস্থার অভ্রান্ত রিপোর্ট প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় তাদের আর অস্বীকার করার জো থাকবে না। তখন তারা সবাই পরিষ্কার ভাষায় অপরাধ স্বীকার করে নেবে।

জ্বিনদের মধ্যেও কি পয়গম্বর প্রেরিত হন ঃ দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জ্বিন ও মানব উভয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে আমার পয়গম্বর কি তোমাদের কাছে পৌঁছেনি ? এতে বোঝা যায় যে, মানব জাতির পয়গম্বর রূপে যেমন মানব প্রেরিত হয়েছে, তেমনি জ্বিন জাতির পয়গম্বর রূপে জ্বিন প্রেরিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে হাদীস ও তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ কেউ বলেন, রসূল ও নবী একমাত্র মানবই হয়েছে। জ্বিন জাতির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষভাবে রসূল হয়নি; বরং মানব রসূলের বাণী স্বজাতির কাছে পৌঁছানোর জন্য জ্বিনদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত হয়েছে। তারা প্রকৃতপক্ষে মানব-রসূলদের দূত ও বার্তাবহ ছিল। অপ্রকৃতভাবে তাদেরকেও রসূল বলে দেওয়া হয়। যেসব তফসীরবিদ এ কথা বলেন, তাঁদের প্রমাণ ঐসব আয়াত, যেগুলোতে জ্বিনদের এ জাতীয় উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীর বাণী অথবা কোরআন শ্রবণ করে স্বজাতির কাছে পৌঁছিয়েছে। উদাহরণত وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ

এবং সূরা জ্বিনের আয়াত قَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا يَّهْدِىْ مُّنْذِرِيْنَ

اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ইত্যাদি।

কিন্তু আয়াতের বাহ্যিক অর্থের দিক দিয়ে একদল আলিম এ বিষয়েরও প্রবক্তা যে, শেষ নবী (সা)-এর পূর্বে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রসূল সে সম্প্রদায় থেকেই প্রেরিত হতেন। মানব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন স্তরে মানব-রসূল এবং জ্বিন জাতির বিভিন্ন স্তরে জ্বিন-রসূলই আগমন করতেন। শেষনবী (সা)-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সমগ্র বিশ্বের মানব ও জ্বিনদের একমাত্র রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন; তাও কোন এক বিশেষ কালের জন্য নয় বরং কিয়ামত অবধি সমস্ত জ্বিন ও মানব তাঁর উম্মত এবং তিনিই সবার রসূল।

জ্বিনদেরই হিন্দুদের কোন রসূল ও নবী হওয়ার সম্ভাবনা ঃ কালবী, মুজাহিদ (র)

প্রমুখ তফসীরবিদ এ উক্তিই পছন্দ করেছেন। কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপতী (র) তফসীর মাযহারীতে এ উক্তি গ্রহণ করে বলেছেন ঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম (আ)-এর পূর্বে জিনদের রসূল জিনদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হত। যখন একথা প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে মানব আগমনের হাজার হাজার বছর পূর্বে জিন জাতি বসবাস করত এবং তারাও মানব জাতির মত বিধি-বিধান পালন করতে আদিষ্ট ছিল, তখন শরীয়ত ও যুক্তির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহ্র বিধান পৌঁছানোর জন্য পয়গম্বর হওয়া অপরিহার্য।

কাযী সানাউল্লাহ্ (র) আরো বলেন ঃ ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাদের বেদের ইতিহাস হাজার হাজার বছরের পুরোনো বলে বর্ণনা করে এবং তাদের অনুসৃত অবতারদের সে যুগেরই লোক বলে উল্লেখ করে। এটা অসম্ভব নয় যে, তারা এ জিন জাতিরই পয়গম্বর ছিলেন এবং তাদেরই আনীত নির্দেশাবলী পুস্তকাকারে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অবতারদের যেসব চিত্র ও মূর্তি মন্দিরসমূহে রাখা হয়, সেগুলোর দেহাকৃতিও অনেকটা এমনি ধরনের। কারও অনেকগুলো মুখমণ্ডল, কারও অনেক হাত-পা, কারও হাতীর মত শুঁড়। এগুলো সাধারণ মানবাকৃতি থেকে ভিন্ন। জিনদের পক্ষে এহেন আকৃতি ধারণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই এটা সম্ভব যে, তাদের অবতার জিন জাতির রসূল কিংবা তাদের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাদের ধর্মগ্রন্থও তাদের নির্দেশাবলীর সমষ্টি ছিল। এরপর আস্তে আস্তে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের ন্যায় একেও পরিবর্তিত করে তাতে শিরক ও মূর্তিপূজা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যদি আসল ধর্মগ্রন্থ এবং জিন জাতির বিশুদ্ধ নির্দেশাবলীও বিদ্যমান থাকত তবুও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাব ও রিসালতের পর তাও রহিত হয়ে যেত, বিকৃত ও পরিবর্তিত ধর্মগ্রন্থের তো কথাই নেই।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানব ও জিনদের মধ্যে রসূল প্রেরণ করা আল্লাহ্ তা'আলার ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহের প্রতীক। তিনি কোন জাতির প্রতি এমনিতেই শাস্তি প্রেরণ করেন না, যে পর্যন্ত না তাদেরকে পূর্বাহ্নে পয়গম্বরদের মাধ্যমে জাগ্রত করা হয় এবং হিদায়তের আলো প্রেরণ করা হয়।

চতুর্থ আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মানব ও জিন জাতির প্রত্যেক স্তরের লোকদের পদমর্যাদা নির্ধারিত রয়েছে। এসব পদমর্যাদা তাদের কাজকর্মের ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতিদান ও শাস্তি এসব কর্মের মাপ অনুযায়ী হবে।

وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ
مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنْشَأَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۝ إِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ
لَاٰتٍ ۙ وَّمَآ أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ۝ قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ إِنِّيْ
عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ مَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۚ إِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ

الظّٰلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا
فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَآئِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمْ
فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَآئِهِمْ ۭ سَآءَ
مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿١٣٦﴾

(১৩৩) আপনার পালনকর্তা অমুখাপেক্ষী, করুণাময়। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে উচ্ছেদ করে দেবেন এবং তোমাদের পর যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলে অভিষিক্ত করবেন; যেমন তোমাদের অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) যে বিষয়ের ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা অক্ষম করতে পারবে না। (১৩৫) আপনি বলে দিন ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্বস্থানে কাজ করে যাও, আমিও কাজ করি। অচিরেই জানতে পারবে যে, পরিণাম গৃহ কে লাভ করে। নিশ্চয় জালিমরা সুফলপ্রাপ্ত হবে না। (১৩৬) আল্লাহ্ যেসব শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, সেগুলো থেকে তারা এক অংশ আল্লাহ্র জন্য নির্ধারণ করে অতঃপর নিজ ধারণা অনুসারে বলে ঃ এটা আল্লাহ্র এবং এটা আমাদের অংশীদারদের। অতঃপর যে অংশ তাদের অংশীদারদের, তা তো আল্লাহ্র দিকে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহ্র তা উপাস্যদের দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কতই না মন্দ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আপনার পালনকর্তা (পয়গম্বরদেরকে এজন্য প্রেরণ করেন না যে, তিনি নাউযুবিল্লাহ্ ইবাদতের মুখাপেক্ষী। তিনি তো) সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী। (তবে রসূল প্রেরণের কারণ এই যে, তিনি) করুণাময়ও বটে। (স্বীয় করুণায় রসূলদের প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁদের মাধ্যমে মানুষ লাভ-লোকসান ও ক্ষতিকর বস্তুসমূহ জানতে পারে, অতঃপর লাভজনক বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারে। আর ক্ষতিকর বস্তু থেকে বিরত থাকতে পারে। সুতরাং এতে বান্দারই উপকার। আল্লাহ্র অমুখাপেক্ষিতা এমন যে,) তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদের সবাইকে (দুনিয়া থেকে হঠাৎ) উচ্ছেদ করে দেবেন এবং তোমাদের পর যাকে (অর্থাৎ যে সৃষ্টজীবকে) ইচ্ছা তোমাদের স্থলে (দুনিয়াতে) অভিষিক্ত করবেন; যেমন (এর নজীর পূর্ব থেকেই বিদ্যমান রয়েছে যে,) তোমাদেরকে (অর্থাৎ যারা এখন বিদ্যমান রয়েছে) অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন (যাদের অস্তিত্ব কোথাও নেই এবং তোমরা তাদেরই স্থলে বিদ্যমান। এমনিভাবে এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু এ ধারা পর্যায়ক্রমে চলছে। আমি ইচ্ছা করলে সহসাই তা করতে পারি। কেননা, কারও থাকা না থাকায় আমার কোন কাজ বন্ধ থাকে না। অতএব পয়গম্বর প্রেরণ আমার কোন অভাব

মোচনের জন্য নয়, বরং তোমাদেরই অভাব মোচনের জন্য। তোমাদের উচিত তাঁদেরকে সত্য বলে বিশ্বাস করা, তাঁদের অনুসরণ করে সৌভাগ্য অর্জন করা এবং কুফর ও অবিশ্বাসের ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করা। কেননা,) যে বিষয়ে (পয়গম্বরদের মাধ্যমে) তোমাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হয়, (অর্থাৎ কিয়ামত ও শাস্তি) তা অবশ্যই আগমন করবে এবং (যদি মনে কর যে, কিয়ামত আগমন করলেও আমরা কোথাও পলায়ন করব---ধরা পড়ব না, যেমন দুনিয়াতে শাসকবর্গের অপরাধীরা মাঝে মাঝে এমন করতে পারে, তবে মনে রেখো) তোমরা (আল্লাহ্‌কে) অক্ষম করতে পারবে না (যে, তাঁর হাতে ধরা পড়বে না। যদি সত্য নির্ধারণে প্রমাণাদি সত্ত্বেও কেউ মনে করে যে, কুফরের পথই উত্তম---ইসলামের পথ মন্দ, অতএব কিয়ামতের আবার কিসের ভয়, তবে তাদের উত্তরে) আপনি (শেষ কথা) বলে দিন ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আপন অবস্থানুযায়ী কাজ কর, আমিও (স্বস্থানে) কাজ করছি। বস্তুত অচিরেই তোমরা জানতে পারবে এ জগতের (অর্থাৎ এ জগতের কাজকর্মের) পরিণতি কার জন্য শুভ (আমাদের জন্য, না তোমাদের জন্য)? এটা নিশ্চিত যে, অত্যাচারীরা কখনও (পরিণামে) সুফল পাবে না। (আর আল্লাহ্‌র প্রতি জুলুম তথা তাঁর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা হল সর্ববৃহৎ অপরাধ। বিশুদ্ধ প্রমাণাদিতে সামান্য চিন্তা করলে বোঝা যেতে পারে যে, ইসলামের পথে অত্যাচার আছে, না কুফরের পথে। যে ব্যক্তি প্রমাণাদিতেও চিন্তা করে না, তাকে এতটুকু বলে দেওয়া যথেষ্ট যে, فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ অতি সত্বর এ কুকর্মের পরিণতি জানতে পারবে।) আর আল্লাহ্ তা'আলা যেসব শস্যক্ষেত্র (ইত্যাদি) এবং জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) সেগুলো থেকে কিছু অংশ আল্লাহ্‌র নামে নির্ধারণ করেছে, (এবং কিছু অংশ প্রতিমাগুলোর নামে নির্ধারণ করেছে ; অথচ এগুলো সৃষ্টি করার মধ্যে কোন অংশীদার নেই) এবং নিজ ধারণা অনুসারে তারা বলে যে, এটা আল্লাহ্‌র (যা অতিথি, মুসাফির, ফকির, মিসকীন ইত্যাদি সাধারণ খাতে ব্যয় হয়) আর এটা আমাদের অংশী উপাস্যদের (যা বিশেষ বিশেষ খাতে ব্যয় হয়)। অতঃপর যে বস্তু তাদের উপাস্যদের (নামের) তা তো আল্লাহ্‌র (নামের অংশের) দিকে পৌঁছে না (বরং ঘটনাচক্রে পৌঁছে গেলেও পৃথক করে ফেলা হয়)। পক্ষান্তরে যে বস্তু আল্লাহ্‌র (নামের,) তা তাদের উপাস্যদের (নামের অংশের) দিকে পৌঁছে যায়। তাদের বিচার কত মন্দ! (কেননা, প্রথমত, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট বস্তু অন্যের নামে কেন যাবে? দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র অংশ থেকেও হ্রাস করা হয়। এর ভিত্তি যদি ধনাঢ্যতা ও অভাবগ্রস্ততা হয়ে থাকে, তবে তাদেরকে অভাবগ্রস্ত স্বীকার করে উপাস্য মনে করা আরও বেশী নির্বুদ্ধিতা।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, জ্বিন ও মানব জাতির প্রত্যেক সম্প্রদায়ে রসূল ও হিদায়ত প্রেরণ করা আল্লাহ্ তা'আলার চিরন্তন রীতি। পয়গম্বরদের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণভাবে সতর্ক না করা পর্যন্ত কুফর, শিরক ও অবাধ্যতার কারণে কখনও তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, পয়গম্বর ও ঐশী গ্রন্থসমূহের অব্যাহত ধারা এ জন্যে ছিল না যে, বিশ্ব পালনকর্তা আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন কিংবা তাঁর কোন কাজ আমাদের আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না, তিনি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও ও অভাবমুক্ত। তবে পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষী হওয়ার সাথে সাথে তিনি দয়াগুণেও গুণান্বিত। সমগ্র বিশ্বকে অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব দান করা এবং বিশ্ববাসীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব প্রয়োজন অযাচিতভাবে মেটানোর কারণও তাঁর এ দয়াগুণ। নতুবা বেচারা মানুষ নিজের প্রয়োজনাদি নিজে সমাধা করার যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা. সে স্বীয় প্রয়োজনাদি চাওয়ার রীতিনীতিও জানে না। বিশেষত অস্তিত্বের যে নিয়ামত দান করা হয়েছে, তা যে চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে, তা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কোন মানুষ কোথাও নিজের সৃষ্টির জন্য দোয়া করেনি এবং অস্তিত্ব লাভের পূর্বে দোয়া করা কল্পনাও করা যায় না। এমনিভাবে অন্তর এবং যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে মানুষের সৃষ্টি, যেমন হাত, পা, মন-মস্তিষ্ক প্রভৃতি এগুলো কোন মানব চেয়েছিল কি? না তার চাওয়ার মত অনুভূতি ছিল? কিছুই নয়, বরং

ما نبود یم وتقاضا ما نبود
لطف تو نا گفتہ ما می شنود

আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নন। জগত সৃষ্টি শুধু তাঁর অনুগ্রহের ফল ঃ মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে رَبُّكَ الْغَنِيُّ শব্দ দ্বারা বিশ্ব পালনকর্তার অমুখাপেক্ষিতা বর্ণনা করার সাথে ذُو الرَّحْمَةِ যোগ করে বলা হয়েছে যে, তিনি যদিও কারও মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু অমুখাপেক্ষিতার সাথে সাথে তিনি ذُو الرَّحْمَةِ অর্থাৎ করুণাময়ও বটে।

আল্লাহ্ যে কোন মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেননি তার তাৎপর্য ঃ অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ্ পাকেরই বিশেষ গুণ। নতুবা মানুষ অপরের প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে গেলে সে অপরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না; বরং অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে উদ্যত হত। কোরআন পাকের এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ অর্থাৎ মানুষ যখন নিজেকে অমুখাপেক্ষী দেখতে পায়, তখন অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যে মেতে ওঠে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এমন

প্রয়োজনাদির শিকলে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলো অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণ হতে পারে না। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাও চাকর-চাকরানীর মুখাপেক্ষী। বিত্তশালী ও মিল মালিক শ্রমিকদের মুখাপেক্ষী। প্রত্যুষে একজন শ্রমিক ও রিক্সাচালক কিছু পয়সা উপার্জন করে অভাব-অনটন দূর করার জন্য যেমন রোজগারের তালাশে বের হয়, ঠিক তেমনিভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিও শ্রমিক, রিক্সা ও যানবাহনের খোঁজে বের হয়। সর্বশক্তিমান সবাইকে অভাব-অনটনের এক শিকলে বেঁধে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মুখাপেক্ষী, কারও প্রতি কারও অনুগ্রহ নেই। এরূপ না হলে কোন ধনী ব্যক্তি কাউকে এক পয়সাও দিত না এবং কোন শ্রমিক কারও সামান্য বোঝাও বহন করত না। এটা একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই বিশেষ গুণ যে, পুরোপুরি অমুখাপেক্ষিতা সত্ত্বেও তিনি দয়ালু, করুণাময়। এস্থলে ذو الرحمة শব্দের পরিবর্তে رحمان কিংবা رحيم শব্দ ব্যবহার করলেও উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়ে যেত; কিন্তু غنى শব্দের সাথে রহমত গুণ সংযোজনের মাধ্যমে বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য ذو الرحمة ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনি غنى ও পুরোপুরি অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও পুরোপুরি রহমতেরও অধিকারী। এ গুণটিই পয়গম্বর ও ঐশীগ্রন্থ প্রেরণের আসল কারণ।

এরপর আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর রহমত যেমন ব্যাপক ও পূর্ণ, তেমনি তাঁর শক্তি-সামর্থ্য প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক কাজে পরিব্যাপ্ত। তিনি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টজগৎ নিশ্চিহ্ন করে দিলেও তাঁর কুদরতের কারখানায় বিন্দুমাত্র পার্থক্য দেখা দেবে না। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে বর্তমান সৃষ্টজগৎকে ধ্বংস করে তদস্থলে অন্য সৃষ্টজগৎ এমনিভাবে এ মুহূর্তে উদ্ভব করে স্থাপন করতে পারেন। এর একটি নজীর প্রতি যুগের মানুষের সামনেই রয়েছে। আজ কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বসবাস করছে এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজ কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। যদি আজ থেকে একশ বছর পূর্বেকার অবস্থার দিকে তাকান যায়, তবে দেখা যাবে, তখনও এ পৃথিবী এমনিভাবে জমজমাট ছিল এবং সব কাজ-কারবার এভাবেই চলত; কিন্তু তখন বর্তমান অধিবাসী ও কার্য পরিচালনাকারীদের কেউ ছিল না। অন্য এক জাতি ছিল, যারা আজ ভূগর্ভে চলে গেছে এবং যাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বর্তমান দুনিয়া সে জাতির বংশধর থেকেই সৃজিত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

إِنْ يَّشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِّنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِيْنَ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে, তোমাদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারেন। 'নিয়ে যাওয়ার' অর্থ এমনভাবে ধ্বংস করে দেওয়া যেন নাম-নিশানা পর্যন্ত অবশিষ্ট না থাকে। তাই এখানে ধ্বংস করা বা মেরে ফেলার কথা বলা হয়নি; বরং নিয়ে যাওয়া বলা হয়েছে। এতে পুরোপুরি ধ্বংস ও নাম-নিশানাহীন করে দেওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অমুখাপেক্ষী হওয়া, করুণাময় হওয়া এবং সর্বশক্তির অধিকারী হওয়ার কথা উল্লেখ করার পর দ্বিতীয় আয়াতে অবাধ্য ও নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে শাস্তির ভয়প্রদর্শন করেছেন, তা অবশ্যই আগমন করবে এবং তোমরা সব একত্রিত হয়েও আল্লাহ্র সে আযাব প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তৃতীয় আয়াতে পুনরায় তাদেরকে হুঁশিয়ার করার জন্য অন্য এক পন্থা অবলম্বন করে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ - فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ - إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ○

এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি মক্কাবাসীদের বলে দিন ঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আমার কথা না মান, তবে তোমাদের ইচ্ছা, না মান এবং স্বস্থানে স্বীয় বিশ্বাস ও হঠকারিতা অনুযায়ী কাজ করতে থাক। আমিও স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। এতে আমার কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু অচিরেই তোমরা জানতে পারবে যে, কে পরকালে মুক্তি ও সফলতা অর্জন করে। মনে রেখ, জালিম অর্থাৎ অধিকার আত্মসাৎকারী কখনও সফল হয় না।

তফসীরবিদ ইবনে কাসীর এ আয়াতের তফসীরে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ স্থলে আয়াতে عَاقِبَةُ الدَّارِ الْآخِرَةِ বলা হয়েছে এবং مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ বলা হয়নি। এতে বোঝা যায় যে, পরজগতের পূর্বে ইহজগতেও পরিণামে আল্লাহ্র সৎ বান্দারাই সফল হয়ে থাকে। যেমন, রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা এর সাক্ষ্য দেয়। অত্যল্পকালের মধ্যেই শক্তিশালী প্রতাপান্বিত শত্রুরা তাঁদের পদানত হয়ে যায় এবং শত্রুদের দেশ তাঁদের হাতে বিজিত হয়ে যায়। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে গোটা আরব উপত্যকা তাঁর অধিকারে এসে যায়। ইয়ামান ও বাহরাইন থেকে শুরু করে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর তাঁর খলীফা ও সাহাবীদের হাতে প্রায় সমগ্র বিশ্ব ইসলামের পতাকাতলে এসে যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার এ ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায় যে, كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي——অর্থাৎ আল্লাহ্ লিখে দিয়েছেন যে, আমি ও আমার পয়গম্বররাই জয়ী হব। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ـ

অর্থাৎ আমি আমার রসূলদের এবং মু'মিনদের অবশ্যই সাহায্য করব, এ জগতেও এবং ঐ দিনও, যেদিন কাজ-কর্মের হিসাব সম্পর্কে সাক্ষ্যদাতারা সাক্ষ্য দিতে দণ্ডায়মান হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

চতুর্থ আয়াতে মুশরিকদের একটি বিশেষ পথভ্রষ্টতা ব্যক্ত করা হয়েছে। আরবদের অভ্যাস ছিল যে, শস্যক্ষেত্র, বাগান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে যা কিছু আমদানী হত, তার এক অংশ আল্লাহ্‌র জন্য এবং এক অংশ উপাস্য দেবদেবীদের নামে পৃথক করে রাখত। আল্লাহ্‌র নামের অংশ থেকে গরীব-মিসকীনকে দান করা হত এবং দেবদেবীর অংশ প্রতিমাগৃহের পূজারী রক্ষকদের জন্য ব্যয় করত।

প্রথমত এটাই কম অবিচার ছিল না যে, যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ এবং সমুদয় উৎপন্ন ফসলও তিনিই দান করেছেন, কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত বস্তুসমূহের মধ্যে প্রতিমাদের অংশীদার করা হত। তদুপরি তারা আরও অবিচার করত এই যে, কখনও উৎপাদন কম হলে তারা কমের ভাগটি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কেটে নিত, অথচ মুখে বলত ঃ আল্লাহ্ তো সম্পদশালী, অভাবমুক্ত, তিনি আমাদের সম্পদের মুখাপেক্ষী নন। এরপর প্রতিমাদের অংশ এবং নিজেদের ব্যবহারের অংশ পুরোপুরি নিয়ে নিত। আবার কোন সময় এমনও হত যে, প্রতিমাদের কিংবা নিজেদের অংশ থেকে কোন বস্তু আল্লাহ্‌র অংশে পড়ে গেলে তা হিসাব ঠিক করার জন্য সেখান থেকে তুলে নিত। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ্‌র অংশ থেকে কোন বস্তু নিজেদের কিংবা প্রতিমাদের অংশে পড়ে যেত, তবে তা সেখানেই থাকতে দিত এবং বলত ঃ আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই। কোরআন পাক তাদের এ পথভ্রষ্টতার উল্লেখ করে বলেছে ঃ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ—অর্থাৎ তাদের এ বিচারপদ্ধতি অত্যন্ত বিশ্রী ও একদেশদর্শী। যে আল্লাহ্ তাদেরকে এবং তাদের সমুদয় বস্তু-সামগ্রীকে সৃষ্টি করেছেন, প্রথমত তারা তাঁর সাথে অপরকে অংশীদার করেছে। তদুপরি তাঁর অংশও নানা ছলছুঁতায় অন্যদিকে পাচার করে দিয়েছে।

কাফিরদের হুঁশিয়ারিতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ঃ, এ হচ্ছে মুশরিকদের একটি পথভ্রষ্টতা ও ভ্রান্তির জন্য হুঁশিয়ারি। এতে ঐসব মুসলমানদের জন্যও শিক্ষার চাবুক রয়েছে, যারা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পূর্ণ কার্যক্ষমতাকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে বয়স ও সময়ের এক অংশ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করে। অথচ জীবনের সমস্ত সময় ও মুহূর্তকে তাঁরই ইবাদত ও আনুগত্যের জন্য ওয়াক্‌ফ করে মানবিক প্রয়োজনাদি মেটানোর জন্য তা থেকে কিছু সময় নিজের জন্য বের করে নেওয়াই সঙ্গত ছিল। সত্য বলতে কি, এর পরও আল্লাহ্‌র যথার্থ কৃতজ্ঞতা আদায় হত না। কিন্তু আমাদের অবস্থা

এই যে, দিবারাত্রির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি কিছু সময় আমরা আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করি, তবে কোন প্রয়োজন দেখা দিলে কাজ-কারবার ও আরাম-আয়েশের সময় পুরোপুরি ঠিক রেখে তার সমস্ত জের নামায, তেলাওয়াত ও ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের উপর ফেলে দেই। কোন অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হলে কিংবা অসুখ-বিসুখ হলে সর্বপ্রথম এর প্রভাব ইবাদতের নির্দিষ্ট সময়ের উপর পড়ে। এটা নিঃসন্দেহে অবিচার, অকৃতজ্ঞতা এবং অধিকার হরণ। আল্লাহ্ আমাদের এবং সব মুসলমানকে এহেন কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيْرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ
لِيُرْدُوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ ۭ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ
وَمَا يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُوْا هٰذِهٖٓ اَنْعَامٌ وَّحَرْثٌ حِجْرٌ ۖ لَّا يَطْعَمُهَآ
اِلَّا مَنْ نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُوْرُهَا وَاَنْعَامٌ لَّا
يَذْكُرُوْنَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَآءً عَلَيْهِ ۭ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْا
يَفْتَرُوْنَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوْا مَا فِيْ بُطُوْنِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُوْرِنَا
وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَا ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرَكَآءُ ۭ
سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ ۭ اِنَّهٗ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿١٣٩﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْٓا
اَوْلَادَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّحَرَّمُوْا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ افْتِرَآءً عَلَى
اللّٰهِ ۭ قَدْ ضَلُّوْا وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٤٠﴾

(১৩৭) এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে দিয়েছে যেন তারা তাদেরকে বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্মমতকে তাদের কাছে বিভ্রান্ত করে দেয়। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব আপনি তাদের এবং তাদের মনগড়া বুলিকে পরিত্যাগ করুন। (১৩৮) তারা বলেঃ এসব চতুষ্পদ জন্তু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না, তাদের ধারণা অনুসারে। আর কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ হারাম করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা ভ্রান্ত ধারণাবশত আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে না। তাদের মনগড়া বুলির কারণে অচিরেই তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। (১৩৯)

তারা বলে ঃ এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য এবং আমাদের মহিলাদের জন্য তা হারাম। আর যদি তা মৃত হয়, তারা সবাই তাতে অংশীদার হয়। অচিরেই তিনি তাদেরকে তাদের বর্ণনার শাস্তি দেবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (১৪০) নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদের নির্বুদ্ধিতাবশত কোন প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং আল্লাহ্ তাদেরকে যেসব দিয়েছিলেন, সেগুলোকে আল্লাহ্র প্রতি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে হারাম করে নিয়েছে। নিশ্চিতই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং সুপথগামী হয়নি।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের কুফর-শিরক সম্পর্কিত ভ্রান্ত বিশ্বাস-সমূহ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের কর্মগত ভ্রান্তি ও মূর্খতাসুলভ বিভিন্ন কুপ্রথা উল্লিখিত হয়েছে। বর্ণিত কুপ্রথাসমূহ হচ্ছে এই ঃ

১. তারা খাদ্যশস্য ও ফলের কিছু অংশ আল্লাহ্র এবং কিছু অংশ দেব-দেবীর নামে পৃথক করত। অতঃপর যদি ঘটনাক্রমে আল্লাহ্র অংশ থেকে কিছু পরিমাণ দেব-দেবীদের অংশে মিশে যেত, তবে তা এমনিই থাকতে দিত। পক্ষান্তরে ব্যাপার উল্টো হলে তা তুলে নিয়ে প্রতিমাগুলোর অংশ পুরো করে দিত। এর বাহানা ছিল এই যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত ; তাঁর অংশ কম হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু অংশীদাররা অভাবগ্রস্ত। তাদের অংশ হ্রাস পাওয়া উচিত নয়। এ কুপ্রথাটি আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্ববর্তী আয়াতে ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২. বহীরা, সায়েবা ইত্যাদি জন্তু দেব-দেবীর নামে ছেড়ে দেওয়া হত এবং বলা হত যে, একাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নিমিত্ত। এতেও প্রতিমার অংশ ছিল এই যে, তাদের আরাধনা করা হত এবং আল্লাহ্র অংশ ছিল এই যে, একে তাঁর সন্তুষ্টি মনে করা হত।

৩. মুশরিকরা তাদের কন্যা সন্তানকে হত্যা করত।

৪. কিছু শস্যক্ষেত্র প্রতিমাদের নামে ওয়াক্ফ করে দিত এবং বলত যে, এর উৎপন্ন ফসল শুধু পুরুষরা ভোগ করবে, মহিলাদেরকে কিছু দেওয়া না দেওয়া আমাদের ইচ্ছাধীন। তাদের দাবী করার অধিকার নেই।

৫. চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও তারা এমনি ধরনের কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করত এবং কোন কোন জন্তু শুধু পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিত।

৬. তারা যেসব চতুষ্পদ জন্তু প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত, সেগুলোতে আরোহণ করা কিংবা বোঝা বহন করা সম্পূর্ণ হারাম মনে করত।

৭. বিশেষ কতকগুলো চতুষ্পদ জন্তুর উপর তারা কোন সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করত না, উদাহরণত দুধ দোহন করার সময়, আরোহণ করার সময় এবং যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করত না।

৮. বহিরা কিংবা সায়েবা নামে অভিহিত করে যেসব জন্তু প্রতিমাদের নামে ছেড়ে দিত, সেগুলোকে যবেহ্ করার সময় পেট থেকে জীবিত বাচ্চা বের হলে তাকেও যবেহ্ করত ; কিন্তু তা শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম মনে করত। পক্ষান্তরে মৃত বাচ্চা বের হলে তা সবার জন্য হালাল হত।

৯. কোন কোন জন্তুর দুধও পুরুষদের জন্য হালাল এবং মহিলাদের জন্য হারাম ছিল।

১০. বহিরা, সায়েবা, ওসীলা, হামী---এ চার প্রকার জন্তুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তারা ইবাদত বলে গণ্য করত।

এসব রেওয়ায়েত দুররে-মনসুর ও রূহুল মা'আনী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে।---(বয়ানুল-কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এমনিভাবে অনেক মুশরিকের ধারণায় তাদের (শয়তান) উপাস্যরা নিজ সন্তান হত্যাকে সুশোভিত করে রেখেছে (যেমন মূর্খতাযুগে কন্যাদের হত্যা অথবা জীবন্ত প্রোথিত করার প্রথা প্রচলিত ছিল)---যেন (এ কুকর্ম দ্বারা) তারা (শয়তান উপাস্যরা) তাদেরকে (অর্থাৎ মুশরিকদের, আযাবের যোগ্য হওয়ার কারণে) বিনষ্ট করে দেয় এবং তাদের ধর্ম-মতকে বিভ্রান্ত করে দেয় (যে, সর্বদা ভুলের মধ্যেই পতিত থাকে। আপনি তাদের সেসব কুকর্মের কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা,) যদি আল্লাহ্ তা'আলা (তাদের মঙ্গল) চাই-তেন, তবে তারা এ কাজ করত না। অতএব আপনি তাদেরকে এবং তারা যে মনগড়া বুলি আওড়াচ্ছে (যে, আমাদের একাজ খুবই ভাল) তাকে এমনিই থাকতে দিন (কোন চিন্তা করবেন না। আমি নিজে বুঝে নেব) এবং তারা (স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা অনুযায়ী) বলে যে, এ সকল (বিশেষ) চতুষ্পদ জন্তু ও (বিশেষ) শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে ইচ্ছা করি, সে ছাড়া এগুলো কেউ খেতে পারবে না (যেমন চতুর্থ ও পঞ্চম কুপ্রথায় উল্লিখিত হয়েছে) এবং (বলে যে, এসব বিশেষ) চতুষ্পদ জন্তু, এগুলোতে আরোহণ ও বোঝা বহন হারাম করা হয়েছে (যেমন ষষ্ঠ কুপ্রথায় বর্ণিত হয়েছে) এবং (বলে যে, এসব বিশেষ) চতুষ্পদ জন্তু, এগুলোর উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা ঠিক নয়। (সেমতে এ বিশ্বাসের কারণেই সেগুলোর উপর) তারা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে না (যেমন ষষ্ঠ কুপ্রথায় বর্ণিত হয়েছে। এসব বিষয়) শুধু আল্লাহ্র উপর ভ্রান্ত ধারণাবশত (বলে। ভ্রান্ত ধারণা এ জন্য যে, তারা এসব বিষয়কে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণ মনে করত।) অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ভ্রান্ত ধারণার শাস্তি দেবেন ('অচিরেই' বলার কারণ এই যে, কিয়ামত বেশী দূরে নয় এবং কিছু কিছু শাস্তি তো মৃত্যুর সাথে সাথেই শুরু হয়ে যাবে) এবং তারা (আরও) বলে যে, এসব চতুষ্পদ জন্তুর পেটে যা আছে, (উদাহরণত দুধ ও বাচ্চা) তা বিশেষভাবে আমাদের পুরুষদের জন্য (হালাল) ও মহিলাদের জন্য হারাম এবং যদি তা (পেটের বাচ্চা) মৃত হয়, তবে তাতে (অর্থাৎ তদ্দ্বারা উপকৃত হওয়ার বৈধতায় নারী ও পুরুষ) সব সমান (যেমন অষ্টম ও নবম কুপ্রথায় উল্লি-খিত হয়েছে।) অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের (এ) ভ্রান্ত বর্ণনার শাস্তি দেবেন। (এ ভ্রান্ত বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত ভ্রান্ত ধারণারই অনুরূপ। এখন পর্যন্ত শাস্তি না দেওয়ার কারণ এই যে) নিশ্চয় তিনি রহস্যশীল। (কোন কোন রহস্যের কারণে সময় দিয়েছেন। এখনই শাস্তি না দেওয়াতে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তিনি জানেন না। কেননা) তিনি মহাজ্ঞানী (সবকিছু তাঁর জানা আছে। অতঃপর পরিণতি ও সার কথা হিসেবে বলেন,) নিশ্চিতই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যারা (উল্লিখিত কাজগুলোকে ধর্ম করে নিয়েছে যে,) স্বীয় সন্তানদের

নির্বুদ্ধিতাবশত কোন (যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণীয়) সনদ ছাড়াই হত্যা করেছে এবং যেসব (হালাল) বস্তু আল্লাহ্ তাদের পানাহারের জন্য দিয়েছিলেন, সেগুলোকে (বিশ্বাসগতভাবে কিংবা কার্যত) হারাম করে নিয়েছে (যেমন উল্লিখিত কুপ্রথাসমূহে এবং দশম কুপ্রথায় বর্ণিত হয়েছে; কারণ সবগুলোর উদ্দেশ্যই এক। এসব বিষয়) শুধু আল্লাহ্র প্রতি ভ্রান্ত ধারণাবশত হয়েছে। (যেমন পূর্বে সন্তান হত্যার এবং চতুষ্পদ জন্তু হারাম করার ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণার কথা পৃথক পৃথকও বলা হয়েছে) নিশ্চয় তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (এ পথভ্রষ্টতা নতুন নয়—পুরাতন। কেননা, পূর্বেও) এবং কখনও সুপথগামী হয়নি। (অতএব ضلوا বাক্যে ধর্মমতের সার কথা, ما كانوا বাক্যে এর তাকিদ এবং خسروا বাক্যে কুপরিণাম অর্থাৎ আযাবের সারকথা ব্যক্ত হয়েছে।)

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۭ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۡ وَلَا تُسْرِفُوْا ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُوْلَةً وَّفَرْشًا ۭ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

(১৪১) তিনি উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন—তাও, যা মাচার উপর তুলে দেওয়া হয় এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র—যেসবের স্বাদ বিভিন্ন এবং যয়তুন ও আনার সৃষ্টি করেছেন—একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন ফলন্ত হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময় এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। (১৪২) তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে বোঝা বহনকারীকে এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীকে। আল্লাহ্ তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তিনিই (আল্লাহ্ পাক) উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন—তাও, যা মাচার উপর চড়ানো হয় (যেমন আঙ্গুর) এবং তাও, যা মাচার উপর চড়ানো হয় না (হয় লতায়িত না হওয়ার কারণে, যেমন কাণ্ড বিশিষ্ট বৃক্ষ, না হয় লতায়িত হওয়া সত্ত্বেও চড়ানোর প্রয়োজন না থাকার কারণে, যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি) এবং খর্জুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র (-ও তিনি সৃষ্টি করেছেন), যেগুলোতে বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যবস্তু (অর্জিত) হয় এবং যয়তুন ও ডালিম (-ও) তিনিই সৃষ্টি করেছেন। যেগুলো (ডালিমে ডালিমে) পরস্পরে (এবং যয়তুনে

যয়তুনে পরস্পরে রং, স্বাদ, আকার ও পরিমাণের মধ্য থেকে কোন কোন গুণেও) একে অন্যের সাদৃশ্যশীল হয় এবং (কখনও) একে অন্যের সাদৃশ্যশীল হয়ও না। (আল্লাহ্ তা'আলা এসব বস্তু সৃষ্টি করে অনুমতি দিয়েছেন যে,) এগুলোর ফসল ভক্ষণ কর (তখন থেকেও) যখন তা নির্গত হয় (এবং অপক্ক থাকে) এবং (এর সাথে এতটুকু অবশ্যই যে,) তাতে (শরীয়তের পক্ষ থেকে) যে হক ওয়াজিব (অর্থাৎ দান-খয়রাত) তা কর্তনের (আহরণের) দিন (মিসকীনদের) দান কর এবং (এ দান করায়ও) সীমা (শরীয়তের অনুমতি) অতিক্রম করো না। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) সীমা (শরীয়তের অনুমতি) অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না এবং (উদ্যান ও শস্যক্ষেত্র যেমন আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, তেমনি জীবজন্তুও। সে মতে) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে উচ্চাকৃতিকে (-ও) এবং খর্বাকৃতিকে (-ও) তিনিই সৃষ্টি করেছেন (এবং এগুলো সম্পর্কেও উদ্যান ও শস্যক্ষেত্রের মত অনুমতি দিয়েছেন যে,) যা কিছু আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়েছেন (এবং শরীয়তে হালাল করেছেন, তা) ভক্ষণ কর এবং (নিজের পক্ষ থেকে হারামের বিধান রচনা করে) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সত্যের প্রমাণাদি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সে তোমাদের পথভ্রষ্ট করছে।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মুশরিকদের এ পথভ্রষ্টতা বর্ণিত হয়েছিল যে, জালিমরা আল্লাহ্ সৃজিত জন্তু-জানোয়ার এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহে স্বহস্ত নির্মিত নিষ্প্রাণ, অচেতন প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্র অংশীদার স্থির করেছিল এবং যেসব বস্তু তারা সদকা-খয়রাতের জন্য পৃথক করত, সেগুলোতে এক অংশ আল্লাহ্ এবং এক অংশ প্রতিমাগুলোর জন্য রাখত। অতঃপর আল্লাহ্র অংশকেও বিভিন্ন ছলছুঁতায় প্রতিমাগুলোর অংশের মধ্যে পাচার করে দিত। এমনি ধরনের আরও অনেক মূর্খতাসুলভ কুপ্রথাকে তারা ধর্মীয় আইনের মর্যাদা দান করেছিল।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উদ্ভিদ ও বৃক্ষের বিভিন্ন প্রকার ও তাদের উপকারিতা ও ফল সৃজনে স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের বিস্ময়কর পরাকাষ্ঠা বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে জানোয়ার ও চতুষ্পদ জন্তুদের বিভিন্ন প্রকার সৃজনের কথা উল্লেখ করে মুশরিকদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন যে, এ কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকেরা কেমন সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র সাথে কেমন অজ্ঞ, অচেতন, নিষ্প্রাণ ও অসহায় বস্তুসমূহকে শরীক ও অংশীদার করে ফেলেছে!

অতঃপর তাদের সরলপথ ও বিশুদ্ধ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছেন যে, যখন এসব বস্তু সৃষ্টি করা ও তোমাদের দান করার কাজে কোন অংশীদার নেই তখন ইবাদতে তাদের অংশীদার করা একান্তই অকৃতজ্ঞতা ও জুলুম। যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করে তোমাদের দান করেছেন এবং এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা যেভাবে ইচ্ছা সেগুলো ব্যবহার করতে পার, এরপরও যেসব বিষয় তোমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, তোমাদের

কর্তব্য সেই সব নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সময় তাঁকে স্মরণে রাখা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। শয়তানী ধ্যান-ধারণা এবং মূর্খতাসুলভ প্রথাকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

প্রথম আয়াতে انشاء শব্দের অর্থ সৃষ্টি করেছেন এবং معروشات—শব্দটি عرش থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ওঠানো এবং উচ্চ করা, معروشات বলে উদ্ভিদের ঐসব লতিকা বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে মাচা বা কাঠামোর উপর চড়ানো হয়; যেমন আঙ্গুর ও কোন শাকসবজি। এর বিপরীতে غير معروشات বলে ঐ সমস্ত বৃক্ষকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর লতা উপরে চড়ানো হয় না; কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ হোক যাদের লতাই হয় না, কিংবা লতাবিশিষ্ট হোক; কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না, যেমন তরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি।

نخل শব্দের অর্থ খর্জুর বৃক্ষ, زرع সর্বপ্রকার শস্য, زيتون যয়তুন বৃক্ষকে বলা হয় এবং এর ফলকেও এবং رمان ডালিমকে বলা হয়।

এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে বাগানে উৎপন্ন বৃক্ষসমূহের দুই প্রকার বর্ণনা করেছেন। এক. যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় এবং দুই. যেসব বৃক্ষের লতা উপরে চড়ানো হয় না। এতে আল্লাহ্র চূড়ান্ত রহস্য ও কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, একই মাটি, একই পানি এবং একই পরিবেশে কেমন বিভিন্ন প্রকার চারা গাছ সৃষ্টি করেছেন। এরপর এদের ফল তৈরী, সজীবতা এবং এদের মধ্যে নিহিত হাজারো বৈশিষ্ট্য ও প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, যতদিন লতা উপরে না চড়ানো হয়, ততদিন প্রথমত ফলই ধরে না---যদি ধরেও, তবে তা বাড়ে না এবং বাকী থাকে না; যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। পক্ষান্তরে কোন বৃক্ষের প্রকৃতি এমন করেছেন যে, লতা উপরে চড়াতে চাইলেও চড়ে না---চড়লেও ফল দুর্বল হয়ে যায়, যেমন খরবুযা, তরমুজ ইত্যাদি। কোন কোন বৃক্ষকে মজবুত কাণ্ডের উপর দাঁড় করিয়ে এত উচ্চে নিয়ে গেছেন যে, মানুষের চেষ্টায় এত উচ্চে নিয়ে যাওয়া স্বভাবত সম্ভবপর ছিল না। বিরাট রহস্যের অধীনে ফলের প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে বৃক্ষসমূহ বিভিন্নরূপ সৃষ্টি করা হয়েছে। কোন কোন ফল মাটি-তেই বাড়ে এবং পরিপক্ক হয় আর কোন কোন ফল মাটির সংস্পর্শে নষ্ট হয়ে যায়। কতক ফলের জন্য উচ্চ শাখায় ঝুলে অবিরাম তাজা বাতাস, সূর্য কিরণ এবং তারকার রশ্মি থেকে রং গ্রহণ করা জরুরী। সর্বশক্তিমান প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

فتبارك الله احسن الخالقين

এরপর বিশেষভাবে খর্জুর বৃক্ষ এবং শস্যের কথা উল্লেখ করেছেন। খর্জুর ফল সাধারণভাবে চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে খাওয়া হয়। প্রয়োজন হলে এ দ্বারা পূর্ণ খাদ্যের কাজও নেওয়া যায়। শস্যক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্য থেকে সাধারণত মানুষের খোরাক এবং জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য সংগ্রহ করা হয়। এ দু'টি বস্তু উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ এখানে اكله এর সর্বনাম زرع এবং نخل উভয়ের দিকে যেতে

পারে। অর্থ এই যে, খেজুরের বিভিন্ন প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ রয়েছে। শস্যের তো শত শত প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের বিভিন্ন স্বাদ ও উপকারিতা আছেই। একই পানি, বাতাস, একই মাটি থেকে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে এত বিরাট ব্যবধান এবং প্রত্যেক প্রকারের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্যের এমন বিস্ময়কর বিভিন্নতা স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিকেও একথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, এদের সৃষ্টিকর্তা এমন এক অচিন্তনীয় সত্তা, যাঁর জ্ঞান ও তাৎপর্য মানুষ অনুমান করতেও সক্ষম নয়।

এরপর আরও দু'টি বস্তুর উল্লেখ করা হয়েছে ঃ যয়তুন ও ডালিম। যয়তুন একাধারে ফল ও তরকারি হয়ে থাকে। এর তৈল সর্বাধিক পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অসংখ্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। এটি হাজারো রোগের উত্তম প্রতিষেধক। এমনিভাবে ডালিমেরও অনেক গুণাগুণ সবার জানা আছে। এ দুই প্রকার ফল উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ — অর্থাৎ এদের প্রত্যেকটির কিছু ফল রং ও স্বাদের দিক দিয়ে সাদৃশ্যশীল হয় এবং কিছু ফলের রং, স্বাদ ও পরিমাণ একই রূপ হয় এবং ভিন্ন ভিন্নও হয়। যয়তুনের অবস্থাও তদ্রূপ।

এসব বৃক্ষ ও ফল উল্লেখ করার পর মানুষের প্রতি দুটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথম নির্দেশ মানুষের বাসনা ও প্রবৃত্তির দাবীর পরিপূরক। বলা হয়েছে ঃ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ অর্থাৎ এসব বৃক্ষের ও শস্য ক্ষেত্রের ফসল আহার কর, যখন এগুলো ফলন্ত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এসব বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা নিজের কোন প্রয়োজন মেটাতে চান না ; বরং তোমাদেরই উপকারের জন্য এগুলো সৃষ্টি করেছেন। অতএব তোমরা খাও এবং উপকৃত হও। اِذَآ اَثْمَرَ বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, বৃক্ষের ডাল থেকে ফল বের করা তোমাদের সাধ্যাতীত কাজ। কাজেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে যখন ফল বের হয়ে আসে, তখনই তোমরা তা খেতে পার---পরিপক্ক হোক বা না হোক।

ক্ষেতের ওশর ঃ দ্বিতীয় নির্দেশ এই দেওয়া হয়েছে ঃ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ শব্দের অর্থ আন অথবা আদায় কর। ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময়কে حصاد বলা হয়। শব্দের সর্বনাম পূর্বোল্লিখিত প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর দিকে যেতে পারে। বাক্যের অর্থ এই যে, এমন বস্তু খাও, পান কর এবং ব্যবহার কর ; কিন্তু মনে রাখবে যে, ফসল কাটা কিংবা ফল নামানোর সময় এদের হকও আদায় করতে হবে। 'হক' বলে ফকীর-মিসকীনকে দান করা বোঝানো হয়েছে।

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ—অর্থাৎ সৎ লোকদের ধন-সম্পদে ফকীর-মিসকীনদের নির্দিষ্ট হক রয়েছে।

এখানে সাধারণ সদকা-খয়রাত বোঝানো হয়েছে, না ক্ষেতের যাকাত-ওশর বোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীদের দু'রকম উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ প্রথমোক্ত মত প্রকাশ করে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন যে, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ এবং যাকাত মদীনায় হিজরত করার দুই বছর পর ফরয হয়েছে। তাই এখানে 'হক'-এর অর্থ ক্ষেতের যাকাত হতে পারে না। পক্ষান্তরে কেউ কেউ আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন এবং حق এর অর্থ যাকাত ও ওশর নিয়েছেন।

তফসীরবিদ ইবনে কাসীর (র) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এবং ইবনে আরাবী উন্দুলুসী 'আহকামুল কোরআনে' এর সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেছেন যে, আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হোক অথবা মদীনায়, উভয় অবস্থাতেই এ আয়াত থেকে শস্য ক্ষেত্রের যাকাত অর্থাৎ ওশর অর্থ নেওয়া যেতে পারে। কেননা, তাঁদের মতে যাকাতের নির্দেশ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সূরা মুয্যাম্মেলের আয়াতে যাকাতের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এ সূরাটি সর্বসম্মতিক্রমে মক্কায় অবতীর্ণ। তবে যাকাতের পরিমাণ ও নিসাব নির্ধারণের নির্দেশ হিজরতের পর অবতীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে একটি হক আরোপ করা হয়েছে। এর পরিমাণ আয়াতে উল্লিখিত হয়নি। কাজেই পরিমাণের ব্যাপারে আয়াতটি সংক্ষিপ্ত। মক্কায় পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, ক্ষেত ও বাগানের ফসল অনায়াসে লাভ করার ব্যাপারে তখন মুসলমানরা নিশ্চিত ছিলেন না। তাই পূর্ব থেকে সৎ লোকের মধ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাই অনুসৃত হত। অর্থাৎ ফসল কাটা ও ফল নামানোর সময় যেসব গরীব-মিসকীন সেখানে উপস্থিত থাকত, তাদেরকে কিছু দান করা হত। কোন বিশেষ পরিমাণ নির্ধারিত ছিল না। ইসলাম পূর্বকালে অন্যান্য উম্মতের মধ্যেও ফল ও ফসল এভাবে দান করার প্রথা কোরআন পাকের اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। হিজরতের দু'বছর পর রসূলুল্লাহ্ (সা) যেমন অন্যান্য ধনসম্পদের যাকাত ও নিসাবের পরিমাণ ওহীর নির্দেশক্রমে বর্ণনা করেন, তেমনিভাবে ফসলের যাকাতও বর্ণনা করেন। মুয়ায ইবনে জাবাল, ইবনে ওমর ও জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) প্রমুখের রেওয়ায়েতক্রমে বিষয়টি সব হাদীস গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত রয়েছে ঃ

ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بالسانية ففصف العشر

অর্থাৎ যেসব ক্ষেতে পানি সেচের ব্যবস্থা নেই, শুধু বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করতে হয়, সেসব ক্ষেতের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে দান করা ওয়াজিব এবং যেসব ক্ষেত কূপের পানি দ্বারা সেচ করা হয়, সেগুলোর উৎপন্ন ফসলের বিশ ভাগের এক ভাগ ওয়াজিব।

ইসলামী শরীয়ত যাকাত আইনে সর্বত্র এ বিষয়টিকে মূলনীতি হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে ফসল উৎপাদনে পরিশ্রম ও ব্যয় কম, তার যাকাতের পরিমাণ বেশী আর পরিশ্রম ও ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যাকাতের পরিমাণও সে পরিমাণে হ্রাস পায়। উদাহরণত যদি কেউ কোন লুক্কায়িত ধনভাণ্ডার পেয়ে বসে কিংবা সোনারূপা ইত্যাদির খনি আবিষ্কৃত হয়, তবে তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসাবে দান করা ওয়াজিব। কেননা এখানে পরিশ্রম ও ব্যয় কম এবং উৎপাদন বেশী। এরপর বৃষ্টি বিধৌত ক্ষেতের নম্বর আসে। এতে পরিশ্রম ও ব্যয় অপেক্ষাকৃত কম। তাই এর যাকাত পাঁচ ভাগের একের অর্ধেক অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর রয়েছে ঐ ক্ষেত, যা কূপ থেকে সেচের মাধ্যমে কিংবা খালের পানি ক্রয় করে সিক্ত করা হয়। এতে পরিশ্রম ও খরচ বেড়ে যায়। ফলে এর যাকাত তারও অর্ধেক। অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। এরপর আসে সাধারণ সোনারূপা ও পণ্যসামগ্রীর পালা। এগুলো অর্জন করতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যধিক। এ জন্য এগুলোর যাকাত তারও অর্ধেক অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে।

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে ক্ষেতের ফসলের জন্য কোন নিসাব নির্ধারিত হয়নি। তাই ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মাযহাব এই যে, ক্ষেতের ফসল কম হোক কিংবা বেশী, সর্বাবস্থায় তার যাকাত বের করা জরুরী। সূরা বাকারার যে আয়াতে ক্ষেতের ফসলের যাকাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেও এর কোন নিসাব বর্ণিত হয়নি। বলা হয়েছে ঃ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ

অর্থাৎ স্বীয় হালাল উপার্জন থেকে ব্যয় কর। এবং ঐ ফসল থেকে, যা আমি তোমাদের জন্য ক্ষেত-খামার থেকে উৎপন্ন করেছি।

রসূলুল্লাহ্ (সা) পণ্যসামগ্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর নিসাব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রূপা সাড়ে বায়ান্ন তোলার কম হলে যাকাত নেই। ছাগল ১০০ এবং উট ৫-এর কম হলে যাকাত নেই। কিন্তু ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত হাদীসে কোন নিসাব ব্যক্ত করা হয়নি। তাই উৎপন্ন ফসল কমবেশী যাই হোক, তার উপর দশ ভাগের এক কিংবা বিশ ভাগের একভাগ যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

অর্থাৎ সীমাতিরিক্ত ব্যয় করো না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না। এখানে প্রশ্ন হয় যে, আল্লাহ্র পথে যদি কেউ সমস্ত ধনসম্পদ বরং জীবনও ব্যয় করে দেয়, তবে একে অপব্যয় বলা যায় না, বরং যথার্থ প্রাপ্য পরিশোধ হয়েছে এরূপ বলাও কঠিন। এমতাবস্থায় এখানে অপব্যয় করতে নিষেধ করার উদ্দেশ্য কি ? উত্তর এই যে, বিশেষ কোন ক্ষেত্রে অপব্যয়ের ফল স্বভাবত অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রুটিরূপে দেখা দেয়। যে ব্যক্তি স্বীয় কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে মুক্ত হস্তে সীমাতিরিক্ত ব্যয় করে, সে সাধারণত অন্যের প্রাপ্য পরিশোধ করতে ত্রুটি করে। এখানে এরূপ ত্রুটি করতেই বারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ একই ক্ষেত্রে স্বীয় যথাসর্বস্ব লুটিয়ে দিয়ে রিক্তহস্ত হয়ে বসে, তবে পরিবার-পরিজন,

আত্মীয়স্বজন বরং নিজের প্রাপ্য কিরূপে পরিশোধ করবে ? তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়ও সুষম হওয়া চাই, যাতে সবার প্রাপ্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

ثَمٰنِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ
حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي
بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٣﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ
قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ
الْأُنْثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ
مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِينَ ﴿١٤٤﴾

(১৪৩) সৃষ্টি করেছেন আটটি নর ও মাদী। ভেড়ার মধ্যে দুই প্রকার ও ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার। জিজ্ঞেস করুন, তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে ? না যা উভয় মাদীর পেটে আছে ? তোমরা আমাকে প্রমাণসহ বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪৪) সৃষ্টি করেছেন উটের মধ্যে দুই প্রকার এবং গরুর মধ্যে দুই প্রকার। আপনি জিজ্ঞেস করুন ঃ তিনি কি উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে, না যা উভয় মাদীর পেটে আছে ? তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন আল্লাহ্ এ নির্দেশ দিয়েছিলেন ? অতএব সে ব্যক্তি অপেক্ষা বেশী অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা ঘোষণা করে যাতে করে মানুষকে বিনা প্রমাণে পথভ্রষ্ট করতে পারে ? নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এবং এসব চতুষ্পদ জন্তু, যেগুলোকে তোমরা হালাল করছ) আটটি নর ও মাদী (সৃষ্টি করেছেন ;) অর্থাৎ ভেড়ার (ও দুম্বার) মধ্যে দুই প্রকার (একটি নর ও একটি মাদী) এবং ছাগলের মধ্যে দুই প্রকার (একটি নর ও একটি মাদী) আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ (আচ্ছা বল দেখি) আল্লাহ্ তা'আলা কি (এ জন্তুদ্বয়ের) উভয় নর হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে (হারাম বলেছেন) ? নাকি (ঐ বাচ্চাকে) যা উভয় মাদীর পেটে আছে ? (বাচ্চা নর হোক কিংবা মাদী। অর্থাৎ যে বিভিন্ন প্রকারের হারাম হওয়ার কথা বলছ, আল্লাহ্ তা'আলা কি এ হারাম করেছেন) ? তোমরা আমাকে কোন প্রমাণ দ্বারা বল যদি (নিজ দাবীতে) তোমরা সত্যবাদী হও। (এ হচ্ছে ছোট আকৃতির জন্তু সম্পর্কে বর্ণনা।

অতঃপর বড় আকৃতির জন্তুদের বর্ণনা হচ্ছে যে, ভেড়া-ছাগলের মধ্যেও মর্দ ও মাদী সৃষ্টি করেছেন ; যেমন বর্ণিত হয়েছে) এবং (এমনিভাবে) উটের মধ্যে দুই প্রকার (একটি মর্দ ও একটি মাদী সৃষ্টি করেছেন) আপনি (তাদেরকে এ সম্পর্কেও) বলুন ঃ (আচ্ছা বল দেখি) আল্লাহ্ তা'আলা কি (এ জন্তুদ্বয়ের) উভয় মর্দকে হারাম করেছেন, না উভয় মাদীকে (হারাম বলেছেন) ? না কি (ঐ বাচ্চাকে) যা উভয় মাদীর পেটে আছে ? (বাচ্চা মর্দ হোক কিংবা মাদী। এর অর্থও পূর্বের মতই যে, তোমরা যে বিভিন্ন প্রকারে হারাম হওয়ার কথা বলছ, আল্লাহ্ তা'আলা এসব কি হারাম করেছেন ? এর কোন প্রমাণ উপস্থিত করা উচিত। এর দু'টি পন্থা থাকতে পারে ঃ এক, কোন রসূল বা ফেরেশতার মাধ্যমে হবে কিংবা দুই, সরাসরি স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাদেরকে এ বিধান দিয়ে থাকবেন। কিন্তু তোমরা তো নবুয়ত ও ওহীতে বিশ্বাসই কর না। সুতরাং একমাত্র দ্বিতীয় পন্থাই থেকে যায়। যদি তাই হয়, তবে বল) তোমরা কি (তখন) উপস্থিত ছিলে যখন আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এ হালাল ও হারামের নির্দেশ দিয়েছিলেন ? (এটা সুস্পষ্ট যে, এরূপ দাবীও হতে পারে না। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই) অতএব, (একথা প্রমাণিত হওয়ার পর এটা নিশ্চিত যে,) ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী (ও মিথ্যাবাদী হবে) যে আল্লাহ্র উপর বিনা প্রমাণে (হালাল ও হারাম সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে যাতে করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করতে পারে ? (অর্থাৎ এ ব্যক্তি অধিক অত্যাচারী। আর) নিশ্চয় আল্লাহ্ এ সম্প্রদায়কে (পরকালে জান্নাতের) পথ প্রদর্শন করবেন না (বরং দোযখে প্রেরণ করবেন। অতএব তারাও এ অপরাধে দোযখে যাবে)।

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ
يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا
اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِيْ ظُفُرٍ ۚ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهُمَآ اِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُوْرُهُمَآ اَوِ الْحَوَايَآ اَوْ مَا
اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۭ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِبَغْيِهِمْ ۡ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿١٤٦﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ
فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْ رَحْمَةٍ وَّاسِعَةٍ ۚ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُهٗ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِيْنَ ﴿١٤٧﴾

(১৪৫) আপনি বলে দিন ঃ যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে আহার করে, কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস—এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা জন্তু যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালংঘন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু। (১৪৬) ইহুদীদের জন্য আমি প্রত্যেক নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু থেকে এতদুভয়ের চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু ঐ চর্বি, যা পৃষ্ঠে কিংবা অন্ত্রে সংযুক্ত থাকে অথবা অস্থির সাথে মিলিত থাকে। তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর আমি অবশ্যই সত্যবাদী। (১৪৭) যদি তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে তবে বলে দিন ঃ তোমাদের পালনকর্তা সুপ্রশস্ত করুণার মালিক। তাঁর শাস্তি অপরাধীদের উপর থেকে টলবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিন ঃ (যেসব জীবজন্তুর আলোচনা হচ্ছে, এগুলো সম্পর্কে) যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে এসেছে তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্য, যা সে আহার করে (তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী)। কিন্তু (যেসব বস্তু অবশ্যই হারাম পাই,---তা) এই যে, মৃত, (অর্থাৎ যে জন্তু যবেহ্ করা জরুরী হওয়া সত্ত্বেও যবেহ্ ছাড়া মারা যায়) কিংবা প্রবাহিত রক্ত কিংবা শূকরের মাংস। কেননা তা (শূকর) সম্পূর্ণ অপবিত্র। (এ কারণেই এর সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপবিত্র ও হারাম। এরূপ অপবিত্রকে 'নাজিসুল আইন' বলা হয়)। কিংবা যা (অর্থাৎ যে জন্তু ইত্যাদি) শেরেকীর মাধ্যমে হয় (তা এভাবে) যে, (নৈকট্য লাভের অভিপ্রায়ে) আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয় (এগুলো সব হারাম)। এরপর (ও এতে এতটুকু অনুমতি আছে যে,) যে ব্যক্তি (ক্ষুধায় অত্যধিক) কাতর হয়ে পড়ে, শর্ত এই যে, (খাওয়ার মধ্যে) স্বাদ অন্বেষণকারী নাহয় এবং (প্রয়োজনের) সীমাতিক্রমকারী না হয়, তবে (এমতাবস্থায় এসব হারাম বস্তু আহারেও তার কোন গোনাহ্ হয় না)। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা (এমন ব্যক্তির জন্য) ক্ষমাশীল, করুণাময়। (কারণ, এহেন সংকট মুহূর্তে দয়া করেছেন এবং গোনাহ্র বস্তু থেকে গোনাহ্ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।) আর ইহুদীদের জন্য আমি সমস্ত নখবিশিষ্ট জন্তু হারাম করেছিলাম এবং ছাগল ও গরু (অর্থাৎ ছাগল ও গরুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) থেকে এতদু-ভয়ের চর্বি আমি তাদের (ইহুদীদের) জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু তা, (অর্থাৎ ঐ চর্বি ব্যতিক্রম ছিল) যা তাদের (উভয়ের) পিঠে কিংবা অন্ত্রে জড়িয়ে থাকে অথবা যা অস্থির সাথে মিলিত থাকে এগুলো ছাড়া সব চর্বি হারাম ছিল। এসব বস্তু হারাম করা প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল না বরং,) তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম এবং আমি নিশ্চয়ই সত্যভাষী। অতঃপর (উল্লিখিত তথ্যের পরও) যদি তারা (মুশরিকরা) আপনাকে (নাউযুবিল্লাহ্, এ বিষয়ে শুধু এ কারণে) মিথ্যাবাদী বলে (যে, তাদের উপর আযাব আসে না) তবে আপনি (উত্তরে) বলে দিন ঃ তোমাদের পালনকর্তা সুপ্রশস্ত করুণার মালিক

(কোন কোন রহস্যের কারণে দ্রুত আযাব দেন না। কাজেই এতে মনে করো না যে, চিরকাল এমনিভাবে বেঁচে যাবে। যখন নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন) তাঁর আযাব অপরাধীদের উপর থেকে (কিছুতেই) টলবে না।

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا
حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا
بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۚ فَلَوْ
شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ
أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۚ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُونَ ﴿١٥٠﴾

(১৪৮) এখন মুশরিকরা বলবে ঃ যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করতেন তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা এবং না আমরা কোন বস্তুকে হারাম করতাম। এমনভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, এমন কি, তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। আপনি বলুন ঃ তোমাদের কাছে কি কোন প্রমাণ আছে। যা আমাদের দেখাতে পার ? তোমরা শুধুমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা শুধু অনুমান করে কথা বল। (১৪৯) আপনি বলে দিন ঃ অতএব পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহ্রই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করতেন। (১৫০) আপনি বলুন ঃ তোমাদের সাক্ষীদের আন, যারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলো হারাম করেছেন। যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে আপনি এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সমতুল্য অংশীদার করে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুশরিকরা এখনই বলবে যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা (সম্মতি হিসাবে) এটা ইচ্ছা করতেন (যে, আমরা শিরকী ও হারাম না করি অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা শিরক না করা ও হারাম না করা পছন্দ করতেন এবং শিরক ও হারাম করাকে অপছন্দ করতেন) তবে না

আমরা শিরক করতাম এবং না আমাদের বাপ-দাদা (শিরক-করত) এবং না (আমাদের বাপ-দাদা) কোন বস্তুকে (যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে) হারাম করতে পারতাম। (এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ শিরক ও হারাম করার কারণে অসন্তুষ্ট নন। আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দেন যে, এ যুক্তি বাতিল। কারণ, এ দ্বারা পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়। সুতরাং তারা পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। যেভাবে তারা করছে,) এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরাও (পয়গম্বরদের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। এমনকি তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে যেমন (দুনিয়াতেই; পূর্ববর্তী অধিকাংশ কাফিরদের উপর আযাব নাযিল হয়েছে কিংবা মৃত্যুর পর তো জানা কথাই। এটা এদিকে ইঙ্গিত যে, তাদের কুফরের মোকাবিলায় শুধু মৌখিক উত্তর ও বিতর্কই করা হবে না, বরং পূর্ববর্তী কাফিরদের অনুরূপ কার্যত শাস্তিও দেওয়া হবে---দুনিয়াতেও কিংবা শুধু পরকালে। অতঃপর দ্বিতীয় উত্তর দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে,) আপনি তাদেরকে বলুন ঃ তোমাদের কাছে কি (এ ব্যাপারে যে, কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা দান সম্মতির লক্ষণ) কোন প্রমাণ আছে? (যদি থাকে) তবে তা আমাদের সামনে প্রকাশ কর। (আসলে প্রমাণ বলতে কিছুই নেই) তোমরা কেবলমাত্র আন্দাজের অনুসরণ কর এবং তোমরা সম্পূর্ণ অনুমান করে কথা বল। (এবং উভয় উত্তর দিয়ে) আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ অতএব (উভয় উত্তর দ্বারা জানা গেল যে,) পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহ্রই। (ফলে তোমাদের যুক্তি বাতিল হয়ে গেছে)। অতএব (এর দাবী তো ছিল এই যে, তোমরা সবাই সৎপথে এসে যেতে। কিন্তু এর তৌফিকও আল্লাহ্ তা'আলারই পক্ষ থেকে আসে)। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সবাইকে (সৎ) পথ প্রদর্শন করতেন। (কিন্তু অনেক রহস্যের কারণে আল্লাহ্ কাউকে তৌফিক দিয়েছেন আর কাউকে দেন নি। তবে সত্য প্রকাশ এবং পছন্দ ও ইচ্ছা সবাইকে ব্যাপকভাবে দান করেছেন। অতঃপর ঐতিহাসিক প্রমাণ চেয়ে বলা হয়েছে ঃ) আপনি (তাদেরকে বলুন) ঃ তোমাদের যুক্তিগত প্রমাণের অবস্থা তো তোমরা জানতেই পারলে, এখন কোন বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থিত কর। উদাহরণত স্বীয় সাক্ষীদেরকে আন, যারা (যথারীতি) সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব (উল্লিখিত) বিষয় হারাম করেছেন। (যথারীতি সাক্ষ্য ঐ সাক্ষ্যকে বলা হয়, যা চাক্ষুষ দেখার ভিত্তিতে কিংবা চাক্ষুষ দেখার মত নিশ্চয়তা দানকারী অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে হয়। যেমন, أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ বাক্যটি এদিকে ইঙ্গিত করে)। অতঃপর যদি (ঘটনাক্রমে কাউকে মিছেমিছি সাক্ষী করে নিয়ে আসে এবং সে সাক্ষী এ বিষয়ে) সাক্ষ্য (ও) দিয়ে দেয়, তবে (যেহেতু সে সাক্ষ্য নিশ্চিতই রীতি-বিরুদ্ধ এবং কথার তুবড়ি ছাড়া আর কিছুই হবে না। কেননা, সে চাক্ষুষ দেখেওনি এবং চাক্ষুষ দেখার মত অকাট্য প্রমাণও তার নেই, তাই) আপনি এ সাক্ষ্য শুনবেন না এবং (যখন كَذَٰلِكَ كَذَّبَ وَلَا حَرَّمْنَا থেকে তাদের মিথ্যারোপকারী হওয়া, অনেক আয়াত থেকে তাদের পরকালে অবিশ্বাসী হওয়া এবং أَشْرَكْنَا থেকে তাদের মুশরিক হওয়া প্রমাণিত হয়ে গেছে তখন। হে সম্বোধিত ব্যক্তি) এরূপ লোকদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং পরকালে বিশ্বাস করে না (এবং এ কারণেই নির্ভীক হয়ে সত্যান্বেষণ করে না)

এবং তারা (উপাস্য হওয়ার যোগ্যতায়) স্বীয় পালনকর্তার সমতুল্য অন্যকে অংশীদার করে (অর্থাৎ শিরক করে)।

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ
نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ
اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَٰذَا
صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

(১৫১) আপনি বলুনঃ এস আমি তোমাদের ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না, পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো, স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা করো না—আমি তোমাদের ও তাদের আহার দিই—নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না, প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্‌ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায়ভাবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ। (১৫২) ইয়াতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায়---যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দিই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্মীয়ও হয়। আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ কর। (১৫৩) তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা সংযত হও।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে) বলুন ঃ এস, আমি তোমাদের ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাই, যেগুলো তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। তা (অর্থাৎ ঐ বিষয়গুলো) এই যে, এক. আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে অংশীদার করো না। (অতএব অংশীদার করা হারাম হলো) এবং দুই. পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো (অতএব তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা হারাম হলো) এবং তিন. স্বীয় সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে (যেমন, জাহিলিয়াত যুগে প্রায় লোকেরই এরূপ অভ্যাস ছিল) হত্যা করো না (কেননা) আমি তাদের এবং তোমাদের (উভয়কে) জীবিকা (যা নির্ধারিত আছে) প্রদান করব (তারা তোমাদের জন্য নির্ধারিত জীবিকায় অংশীদার নয়। এমতাবস্থায় কেন হত্যা কর ? অতএব হত্যা করা হারাম হলো।) এবং চার. নির্লজ্জতার (অর্থাৎ ব্যভিচারের) যত পন্থা আছে, সেগুলোর কাছেও যেয়ো না (অতএব ব্যভিচার হারাম হলো)। প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য (এগুলোই পন্থা,) এবং পাঁচ. যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না ; কিন্তু (শরীয়তের) হকের কারণে (হত্যা জায়েয, উদাহরণত কিসাস কিংবা ব্যভিচারের সাজা হিসাবে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করা। অতএব অন্যায় হত্যা হারাম হলো) এ বিষয়ে (অর্থাৎ এসব বিষয়ে) তোমাদের (আল্লাহ্ তা'আলা) জোর নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা (এগুলোকে বুঝ এবং সে অনুপাতে কাজ কর) এবং ছয়. ইয়াতীমের মালের কাছে যেয়ো না (অর্থাৎ তাতে হস্তক্ষেপ করো না) কিন্তু এমনভাবে, (হস্তক্ষেপের অনুমতি আছে) যা শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম। (উদাহরণত তার কাজে ব্যয় করা, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং কোন কোন অভিভাবকের জন্য ইয়াতীমের স্বার্থে ব্যবসা করারও অনুমতি আছে)। যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয় (সে সময় পর্যন্ত উল্লিখিত হস্তক্ষেপসমূহেরও অনুমতি রয়েছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে তার মাল তার হাতে সমর্পণ করা হবে, যদি সে নির্বোধ না হয়। অতএব ইয়াতীমের মালে অবৈধ হস্তক্ষেপ হারাম হলো) এবং সাত. ওজন ও মাপ পূর্ণ করো ন্যায় সহকারে (যেন কারও প্রাপ্য তোমার কাছে না থাকে। অতএব ওজন ও মাপে প্রতারণা করা হারাম হলো। এসব বিধান কঠিন নয়। কেননা,) আমি (তো) কাউকে তার সাধ্যের অতীত বিধি-বিধানের কষ্ট (-ও) দিই না। (এমতাবস্থায় এসব বিধানে কেন ত্রুটি করা হবে) ? এবং আট. যখন তোমরা (ফয়সালা অথবা সাক্ষ্য ইত্যাদি সম্পর্কে কোন) কথা বল, তখন (যাতে) সুবিচার (হয়, এর প্রতি লক্ষ্য) কর যদিও সে (ঐ ব্যক্তি যার বিপক্ষে তুমি কথা বলছ, তোমার) আত্মীয়ও হয়। (অতএব সুবিচারের পরিপন্থী কথা বলা হারাম হলো)। এবং নয়, আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার কর, (যেমন শপথ, মানত যদি শরীয়তসম্মত হয়) তা পূর্ণ করো (অতএব, অঙ্গীকার পূর্ণ না করা হারাম হলো)। এ বিষয়ে (অর্থাৎ এসব বিষয়ে) তোমাদেরকে (আল্লাহ্ তা'আলা) জোর নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা স্মরণ রাখ (এবং কাজ কর)। এবং এ কথা (ও বলে দিন) যে, (এসব বিধানেরই বিশেষত্ব নয় ; বরং) এ ধর্ম (ইসলাম ও তার সমস্ত বিধান) আমার পথ (যার দিকে আমি আল্লাহ্‌র নির্দেশ আহবান করি) যা (সম্পূর্ণ) সরল (এবং সঠিক)। অতএব এ পথ অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না তাহলে সেসব পথ তোমাদের আল্লাহ্‌র পথ থেকে (যার দিকে আমি আহবান করি) পৃথক (ও দূরবর্তী) করে দেবে।

এ বিষয়ে আল্লাহ্ তোমাদের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা (এ পথের বিরুদ্ধাচরণে) সংযত হও।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে প্রায় দু'তিন রুকূতে অব্যাহতভাবে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে যে, গাফিল ও মূর্খ মানুষ ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রেরিত আইন পরিত্যাগ করে পৈতৃক ও মনগড়া কুপ্রথাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তু অবৈধ করেছিলেন, সেগুলোকে তারা বৈধ মনে করে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ কর্তৃক হালালকৃত অনেক বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে এবং কোন কোন বস্তুকে শুধু পুরুষদের জন্য হালাল এবং স্ত্রীদের জন্য হারাম করেছে। আবার কোন কোন বস্তুকে স্ত্রীদের জন্য হালাল, পুরুষদের জন্য হারাম করেছে।

আলোচ্য তিন আয়াতে সেসব বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করেছেন। বিশদ বর্ণনায় নয়টি বস্তুর উল্লেখ হয়েছে। এরপর দশম নির্দেশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ অর্থাৎ এ ধর্মই হচ্ছে আমার সরল পথ। এ পথের অনুসরণ কর। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আনীত ও বর্ণিত ধর্মের প্রতি ইঙ্গিত করে সমস্ত হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, মকরূহ ও মোস্তাহাব বিষয়কে এ ধর্মে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্ম যে বিষয়কে হালাল বলেছে, তাকে হালাল এবং যে বিষয়কে হারাম বলেছে, তাকে হারাম মনে করবে---নিজের পক্ষ থেকে হালাল-হারামের ফতোয়া জারি করবে না।

আলোচ্য আয়াতসমূহে যে দশটি বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর আসল লক্ষ্য হচ্ছে হারাম বিষয়সমূহ বর্ণনা করা। কাজেই সবগুলোকে নিষেধাজ্ঞার ভঙ্গিতে বর্ণনা করাই ছিল সঙ্গত, কিন্তু কোরআন পাক স্বীয় বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতি অনুসারে তন্মধ্যে কয়েকটি বিষয়কে ধনাত্মকভাবে আদেশের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। তার উদ্দেশ্য এই যে, এর বিপরীত করা হারাম। ---(কাশ্শাফ) এর তাৎপর্য পরে জানা যাবে। আয়াতে বর্ণিত দশটি হারাম বিষয় হচ্ছে এই ঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ইবাদত ও আনুগত্যে কাউকে অংশীদার স্থির করা ; ২. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার না করা ; ৩. দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করা ; ৪. নির্লজ্জতার কাজ করা ; ৫. কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা ; ৬. ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মসাৎ করা ; ৭. ওজন ও মাপে কম দেওয়া ; ৮. সাক্ষ্য, ফয়সালা অথবা অন্যান্য কথাবার্তায় অবিচার করা ; ৯. আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ না করা ; এবং ১০. আল্লাহ্ তা'আলার সোজা-সরল পথ ছেড়ে এদিক-ওদিক অন্য পথ অবলম্বন করা।

আলোচ্য আয়াতসমূহের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ঃ তওরাত বিশেষজ্ঞ কা'বে আহবার

পূর্বে ইহুদী ছিলেন, অতঃপর মুসলমান হয়ে যান। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কিতাব তওরাত বিস্‌মিল্লাহর পর কোরআন পাকের এসব আয়াত দ্বারাই শুরু হয়, যেগুলোতে দশটি হারাম বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও বর্ণিত আছে যে, এ দশটি বাক্যই হযরত মূসা (আ)-র প্রতিও অবতীর্ণ হয়েছিল।

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা আলে-ইমরানে মুহ্‌কাম আয়াতের বর্ণনায় এ আয়াতগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী (সা) পর্যন্ত সব পয়গম্বরের শরীয়তই এসব আয়াত সম্পর্কে একমত। কোন ধর্ম ও শরীয়তে এগুলোর কোনটিই মনসূখ বা রহিত হয়নি।---(তফসীরে বাহ্‌রে-মুহীত)

এসব আয়াত রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র ওসীয়তনামা ঃ তফসীরে ইবনে কাসীরে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মসউদ (রা)-এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-র মোহরাঙ্কিত ওসীয়তনামা দেখতে চায়, সে যেন এ আয়াতগুলো পাঠ করে। এসব আয়াতে ঐ ওসীয়ত বিদ্যমান, যা রসূলুল্লাহ্‌ (সা) আল্লাহ্‌র নির্দেশে উম্মতকে দিয়েছেন।

হাকেম হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা) বলেছেন ঃ কে আছে, যে আমার হাতে তিনটি আয়াতের আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করবে ? অতঃপর তিনি আলোচ্য তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন ঃ যে ব্যক্তি এ শপথ পূর্ণ করবে, তাকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্‌র দায়িত্ব।

এবার দশটি বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা এবং আয়াতত্রয়ের তফসীর লক্ষ্য করুন। আয়াতগুলোর সূচনা এভাবে করা হয়েছে ঃ قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ

تَعَالَوْا এতে عَلَيْكُمْ শব্দের অর্থ 'এস'। আসলে উচ্চস্থানে দণ্ডায়মান হয়ে নিম্নের লোকদের নিজের কাছে ডাকা অর্থে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ দাওয়াত কবুল করার মধ্যেই তাদের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিদ্যমান। এখানে রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে বলুন ঃ এস, যাতে আমি তোমাদের ঐসব বিষয় পাঠ করে শোনাতে পারি, যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। এটা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত বার্তা। এতে কারও কল্পনা, আন্দাজ ও অনুমানের কোন প্রভাব নেই, যাতে তোমরা এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করতে যত্নবান হও এবং অনর্থক নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বিষয়সমূহকে হারাম না কর।

এ আয়াতে যদিও সরাসরি মক্কার মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি ব্যাপক হওয়ার কারণে সমগ্র মানব জাতিই এর আওতাধীন---মু'মিন হোক কিংবা কাফির, আরব হোক কিংবা অনারব, উপস্থিত লোকজন হোক কিংবা অনাগত বংশধর।---(বাহ্‌রে-মুহীত)

সর্বপ্রথম মহাপাপ শিরক, যা হারাম করা হয়েছে ঃ এরূপ সযত্ন সম্বোধনের পর হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের তালিকায় সর্বপ্রথম বলা হয়েছে ঃ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا অর্থাৎ সর্বপ্রথম কাজ এই যে, আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক ও অংশীদার করো না। আরবের মুশরিকদের মত দেব-দেবীদের বা মূর্তিকে আল্লাহ্ মনে করো না। ইহুদী ও খৃস্টানদের মত পয়গম্বরদের আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্‌র পুত্র বলো না। অন্যদের মত ফেরেশতাদের আল্লাহ্‌র কন্যা বলে আখ্যা দিয়ো না। মূর্খ জনগণের মত পয়গম্বর ও ওলীদের জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্যে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করো না।

শিরকের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ঃ তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ এখানে شَيْئًا -এর অর্থ এরূপও হতে পারে যে, 'জলী' অর্থাৎ প্রকাশ্য শিরক ও প্রচ্ছন্ন শিরক---এ প্রকারদ্বয়ের মধ্য থেকে কোনটিতেই লিপ্ত হয়ো না। প্রকাশ্য শিরকের অর্থ সবাই জানে যে, ইবাদত, আনুগত্য অথবা অন্য কোন বিশেষ গুণে অন্যকে আল্লাহ্ তা'আলার সমতুল্য অথবা তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা। প্রচ্ছন্ন শিরক এই যে, নিজ কাজকর্মে ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্যসমূহে এবং লাভ-লোকসানে আল্লাহ্ তা'আলাকে কার্যনির্বাহী বলে বিশ্বাস করা ও কার্যত অন্যান্যকে কার্যনির্বাহী মনে করা এবং যাবতীয় প্রচেষ্টা অন্যদের সাথেই জড়িত রাখা। এছাড়া লোক দেখানো ইবাদত করা, অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নামায ইত্যাদি ঠিকমত পড়া, নামযশ লাভের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা অথবা কার্যত লাভ-লোকসানের মালিক আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সাব্যস্ত করা ইত্যাদিও প্রচ্ছন্ন শিরকের অন্তর্ভুক্ত। শেখ সাদী (র) এ বিষয়টি বর্ণনা করে বলেন ঃ

دریں نوے از شرک پوشیدہ است
کہ زیدم بخشید وعمرم بخست

অর্থাৎ যায়েদ আমাকে দান করেছে এবং ওমর আমার ক্ষতি করেছে এমন বলার মধ্যেও এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শিরক বিদ্যমান। সত্য এই যে, দান ও ক্ষতি সব সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই হয়। যায়েদ কিংবা ওমর হচ্ছে পর্দা, যার ভেতর থেকে দান ও ক্ষতি প্রকাশ পায়। উদ্ধৃত হাদীস অনুযায়ী যদি সারা বিশ্বের জ্বিন ও মানব একত্রিত হয়ে তোমার এমন কোন উপকার করতে চায়, যা আল্লাহ্ তোমার জন্য অবধারিত করেননি, তবে তাদের তা করার সাধ্য নেই। পক্ষান্তরে যদি সারা বিশ্বের জ্বিন ও মানব একজোট হয়ে তোমার এমন কোন ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত নয়, তবে তা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।

মোট কথা, প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয় প্রকার শিরক থেকেই বেঁচে থাকা দরকার। প্রতিমা ইত্যাদির পূজাপাট যেমন শিরকের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গম্বর ও ওলীদেরকে জ্ঞান ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্ তা'আলার সমতুল্য মনে করাও অন্যতম শিরক। আল্লাহ্ না করুন, যদি কারও বিশ্বাস এরূপ হয় তবে তা প্রকাশ্য শিরক। আর বিশ্বাস এরূপ না হয়ে

কাজ এরূপ করলে তা হবে প্রচ্ছন্ন শিরক। এ স্থলে সর্বপ্রথম শিরক থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, শিরকের অপরাধ সম্পর্কে কোরআন পাকের সিদ্ধান্ত এই যে, এর ক্ষমা নেই। এ ছাড়া অন্যান্য গোনাহ্‌র ক্ষমা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এ কারণেই হাদীসে ওবাদা ইবনে সামেত ও আবুদ্দারদা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার করো না, যদিও তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলা হয় অথবা শূলিতে চড়ানো হয় অথবা জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়।

দ্বিতীয় গোনাহ পিতামাতার সাথে অসদ্ব্যবহার ঃ এরপর দ্বিতীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا—অর্থাৎ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। উদ্দেশ্য এই যে, পিতামাতার অবাধ্যতা করো না। তাদেরকে কষ্ট দিও না ; কিন্তু বিজ্ঞ-জনোচিত ভঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। এতে এদিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, পিতামাতার অবাধ্যতা না করা এবং কষ্ট না দেওয়াই যথেষ্ট নয় ; বরং সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখা ফরয। কোরআন পাকের অন্যত্র একথাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ

এ আয়াতে পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়াকে শিরকের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, অন্য এক আয়াতে তাদের আনুগত্য ও সুখ বিধানকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করে বলা হয়েছে ঃ وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا—অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা ফয়সালা করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ অর্থাৎ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং পিতামাতার। অতঃপর আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে অর্থাৎ বিপরীত করলে শাস্তি পাবে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সর্বোত্তম কাজ কোন্‌টি ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ নামায মুস্তাহাব সময়ে পড়া। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন ঃ এরপর কোন্‌টি উত্তম ? উত্তর হল ঃ পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার। আবার প্রশ্ন হল ঃ এরপর কোন্‌টি ? উত্তর হল ঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে ঃ একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা) তিনবার বললেন ঃ رغم انفه، رغم انفه، رغم انفه অর্থাৎ সে লাঞ্ছিত

হয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ ! কে লাঞ্ছিত হয়েছে ? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি পিতামাতাকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।

উদ্দেশ্য এই যে, বার্ধক্যাবস্থায় পিতামাতার সেবা-যত্ন দ্বারা জান্নাত লাভ নিশ্চিত। ঐ ব্যক্তি বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত, যে জান্নাত লাভের এমন সহজ সুযোগ হাতছাড়া করে ঃ সহজ সুযোগ এজন্য যে, পিতামাতা সন্তানের প্রতি স্বভাবতই মেহেরবান হয়ে থাকেন। সামান্য সেবা-যত্নেই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বিরাট কিছু করার দরকার হয় না। বার্ধক্যের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, পিতামাতা যখন শক্ত-সমর্থ ও সুস্থ থাকেন, নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারেন বরং সন্তানদেরও আর্থিক ও দৈহিক সাহায্য করেন, তখন তাঁরা সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী নন এবং এ সেবা-যত্নের বিশেষ কোন মূল্যও নেই। তাঁরা যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন, তখনকার সেবা-যত্নই মূল্যবান হতে পারে।

তৃতীয় হারাম সন্তান হত্যা ঃ আয়াতে বর্ণিত তৃতীয় হারাম বিষয় হচ্ছে সন্তান হত্যা। এখানে পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, ইতিপূর্বে পিতামাতার হক বর্ণিত হয়েছে, যা সন্তানের কর্তব্য। এখন সন্তানের হক বর্ণিত হচ্ছে, যা পিতামাতার দায়িত্ব। জাহিলিয়াত যুগে সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে রাখা কিংবা হত্যা করার ব্যাপারটি ছিল সন্তানের সাথে অসদ্ব্যবহারের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। আয়াতে তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ

—অর্থাৎ দারিদ্র্যের কারণে স্বীয় সন্তানদের হত্যা করো না। نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ

আমি তোমাদের এবং তাদের---উভয়কে জীবিকা দান করব।

জাহিলিয়াত যুগে এ নিকৃষ্টতম নির্দয়-পাষাণ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে কাউকে জামাতা করার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হত। মাঝে মাঝে জীবিকা নির্বাহ কঠিন হবে মনে করে পাষণ্ডরা নিজ হাতে সন্তানদেরকে হত্যা করত। কোরআন পাক এ কুপ্রথা রহিত করে দিয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে তাদের সেই মানসিক ব্যাধিরও প্রতিকার বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা এ ঘৃণ্য অপরাধে লিপ্ত হত। সন্তানের পানাহারের সংস্থান কোথা থেকে হবে, এ ভাবনাই ছিল তাদের মানসিক রোগ। আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে ব্যক্ত করেছেন যে, পানাহার করানো এবং জীবিকা প্রদানের আসল দায়িত্ব তোমাদের নয়। এ কাজ সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার। তোমরা স্বয়ং জীবিকা ও পানাহারে তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি দিলে তোমরা সন্তানদেরকেও দিয়ে থাক। তিনি না দিলে তোমাদের কি সাধ্য যে, একটি গম অথবা চালের দানা নিজে সৃষ্টি করবে। শক্ত মাটির বুক চিরে বীজকে অঙ্কুরিত করা, অতঃপর তাকে বৃক্ষের আকার দান করা, অতঃপর ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ করা কার কাজ ? পিতামাতা এ কাজ করতে পারে

কি ? এগুলো সব সর্বশক্তিমানের কুদরতের কারসাজি। এ কাজে মানুষের কোন হাত নেই। সে শুধু মাটিকে নরম করতে এবং চারা গজালে পানি দিতে পারে। কিন্তু ফুল-ফল সৃষ্টিতে তার বিন্দুমাত্রও হাত নেই। অতএব পিতামাতার এ ধারণা অমূলক যে, তারা সন্তানদেরকে রিযিক দান করে। বরং আল্লাহ্ তা'আলার অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে পিতামাতাও পায় এবং সন্তানরাও। তাই এখানে প্রথমে পিতামাতার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরও রিযিক দেব এবং তাদেরও। এতে আরও ইঙ্গিত হতে পারে যে, তোমাদের রিযিক এজন্য দেওয়া হয় যাতে তোমরা সন্তানদের পৌঁছে দাও ; এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ انما تنصرون و ترزقون بضعفائكم অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল ও অক্ষম লোকদের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাহায্য করেন ও রিযিক দান করেন।

সূরা ইসরায়ও বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানে রিযিকের ব্যাপারে প্রথমে সন্তান-দের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ — অর্থাৎ আমি তাদেরও রিযিক দেব এবং তোমাদেরও। এতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমার কাছে রিযিকের প্রথম হকদার দুর্বল ও অক্ষম সন্তানরা। তাদের খাতিরেই তোমাদেরও দেওয়া হয়।

সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন না করা এবং ধর্মবিমুখতার জন্য স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও এক প্রকার সন্তান হত্যা ঃ আয়াতে বর্ণিত সন্তান হত্যা যে অপরাধ ও কঠোর গোনাহ্ তা বাহ্যিক হত্যা ও মেরে ফেলার অর্থে তো সুস্পষ্টই। চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সন্তানকে শিক্ষা-দীক্ষা না দেওয়া এবং তার চরিত্র গঠন না করা, যদ্দরুন সে আল্লাহ্, রসূল ও পরকালের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ে এবং চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে, এটাও সন্তান হত্যার চাইতে কম মারাত্মক নয়। কোরআন পাকের ভাষায় সে ব্যক্তি মৃত, যে আল্লাহ্‌কে চেনে না এবং তাঁর আনুগত্য করে না। اَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ — আয়াতে তাই বর্ণিত হয়েছে, যারা সন্তানদের কাজকর্ম ও চরিত্র সংশোধনের প্রতি মনোযোগ দেয় না, তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয় কিংবা এমন ভ্রান্ত শিক্ষা দেয়, যার ফলে ইসলামী চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়, তারাও একদিক দিয়ে সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী। বাহ্যিক হত্যার প্রভাবে তো শুধু ক্ষণস্থায়ী জাগতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এ হত্যা মানুষের পারলৌকিক ও চিরস্থায়ী জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করে।

চতুর্থ হারাম নির্লজ্জ কাজ ঃ আয়াতে বর্ণিত হারাম বিষয় হচ্ছে নির্লজ্জ কাজ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ অর্থাৎ প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন, যে কোন রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না।

فَوَاحِشَ শব্দটি فاحشة-এর বহুবচন। فاحشة ও فحشاء، فحش

সবগুলো ধাতু। এগুলোর অর্থ সাধারণত অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা হয়। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এসব শব্দের অর্থ হচ্ছে এমন সব কাজ, যার অনিষ্টতা ও খারাবী সুদূরপ্রসারী। ইমাম রাগেব (র) 'মুফরাদাতুল কোরআন' গ্রন্থে এবং ইবনে আসীর নেহায়াহ্ গ্রন্থে এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। কোরআন পাকের বিভিন্ন জায়গায় এসব কাজের নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ

যাবতীয় বড় গোনাহ্ فحش ও فحشاء-এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত, তা উক্তি সম্পর্কিত হোক কিংবা কর্ম সম্পর্কিত, বাহ্যিক হোক কিংবা অভ্যন্তরীণ। এছাড়া আত্মিক ব্যভিচার ও নির্লজ্জতার যাবতীয় কাজও এর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই সাধারণ ভাষায় এ শব্দটি ব্যভিচারের অর্থে ব্যবহৃত হয়, কোরআনের আলোচ্য আয়াতে নির্লজ্জ কাজসমূহের কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। ব্যাপক অর্থ নেওয়া হলে যাবতীয় বদভ্যাস, মুখ, হাত-পা ও অন্তরের যাবতীয় গোনাহ্ই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অর্থ ব্যভিচার নেওয়া হলে আয়াতে ব্যভিচার ও তার ভূমিকা এবং কারণসমূহ বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতেই فواحش-এর ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ প্রথমোক্ত অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فواحش-এর অর্থ হবে হাত, পা ইত্যাদি দ্বারা সম্পন্ন গোনাহ্ এবং অভ্যন্তরীণ فواحش-এর অর্থ হবে অন্তর সম্পর্কিত গোনাহ্। যেমন, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, অকৃতজ্ঞতা, অধৈর্য ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী বাহ্যিক فواحش--এর অর্থ এমন ব্যভিচার যা প্রকাশ্যে করা হয়। আর অভ্যন্তরীণের অর্থ যে ব্যভিচার গোপনে করা হয়। ব্যভিচারের ভূমিকাও প্রকাশ্য ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। কুনিয়তে পর-নারীকে দেখা, হাতে স্পর্শ করা এবং তার সাথে প্রেমালাপ করা এরই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে ব্যভিচার সম্পর্কিত যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা, সংকল্প এবং গোপন কৌশল অবলম্বন অভ্যন্তরীণ ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ বাহ্যিক নির্লজ্জতার অর্থ সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজকর্ম এবং অভ্যন্তরীণ নির্লজ্জতার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে নির্লজ্জ কাজকর্ম, যদিও সাধারণভাবে মানুষ সেগুলোকে খারাপ মনে করে না কিংবা সেগুলো যে হারাম, তা সাধারণ মানুষ জানে না। উদাহরণত স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার পরও তাকে স্ত্রী হিসাবে রেখে দেওয়া কিংবা হালাল নয় এরূপ মহিলাকে বিবাহ করা।

মোট কথা এই যে, এ আয়াত নির্লজ্জতার প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত গোনাহ্কে এবং সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থের দিক দিয়ে ব্যভিচারের প্রকাশ্য

ও গোপন সকল পন্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। এ সম্পর্কে নির্দেশ এই যে, এগুলোর কাছেও যেয়ো না। কাছে না যাওয়ার অর্থ এরূপ মজলিস ও স্থান থেকে বেঁচে থাক, যেখানে গেলে গোনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে এবং এরূপ কাজ থেকেও বেঁচে থাক, যদ্দ্বারা এসব গোনাহ্‌র পথ খুলে যায়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ من حام حول حمى أوشك أن يقع فيه অর্থাৎ যে লোক নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, সে তাতে প্রবেশ করার কাছাকাছি হয়ে যায়।

অতএব নিষিদ্ধ জায়গার আশেপাশে ঘোরাফেরা না করাই হল সতর্কতা।

পঞ্চম হারাম অন্যায় হত্যা ঃ পঞ্চম হারাম বিষয় হচ্ছে অন্যায় হত্যা। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না, তবে ন্যায়ভাবে। এ 'ন্যায়ভাবে'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তিনটি কারণ ছাড়া কোন মুসলমানের খুন হালাল নয়। এক. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হলে, দুই. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার কিসাস হিসাবে তাকে হত্যা করা যাবে এবং তিন. সত্য ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে।

খলীফা হযরত উসমান গনী (রা) যখন বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন এবং বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখনও তিনি তাদেরকে এ হাদীস শুনিয়ে বলেছিলেন ঃ আল্লাহ্‌র রহমতে আমি এ তিনটি কারণ থেকেই মুক্ত। মুসলমান হয়ে তো দূরের কথা জাহিলিয়াত যুগেও আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হইনি, আমি কোন খুন করিনি, স্বীয় ধর্ম ইসলাম পরিত্যাগ করব---এরূপ কল্পনাও আমার মনে কখনো জাগেনি। এমতাবস্থায় তোমরা আমাকে কি কারণে হত্যা করতে চাও ?

বিনা কারণে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যেমন হারাম, তেমনিভাবে এমন কোন অমুসলমানকে হত্যা করাও হারাম, যে কোন ইসলামী দেশের প্রচলিত আইন মান্য করে বসবাস করে কিংবা যার সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকে।

তিরমিযী ও ইবনে মাযাহ্ গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন যিম্মী অমুসলিমকে হত্যা করে, সে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। যে আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধি সত্তর বছরের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে। এই একটি আয়াতে দশটির মধ্যে পাঁচটি হারাম বিষয়ের বর্ণনা দেওয়ার পর বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ অর্থাৎ এসব বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝ।

ষষ্ঠ হারাম ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা ঃ দ্বিতীয় আয়াতে ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করা যে হারাম, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

অর্থাৎ ইয়াতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, কিন্তু উত্তম পন্থায়, যে পর্যন্ত না সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে যায়। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ইয়াতীম শিশুদের অভিভাবককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তারা যেন ইয়াতীমদের মালকে আগুন মনে করে এবং অবৈধভাবে তা খাওয়া ও নেওয়ার কাছেও না যায়। অন্য এক আয়াতে অনুরূপ ভাষায়ই বলা হয়েছে যে, যারা ইয়াতীমদের মাল অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুন ভর্তি করে।

তবে ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণ করা এবং স্বভাবত লোকসানের আশংকা নেই--এরূপ কারবারে নিয়োগ করে তা বৃদ্ধি করা উত্তম ও জরুরী পন্থা। ইয়াতীমদের অভিভাবকের এ পন্থা অবলম্বন করাই উচিত।

এরপর ইয়াতীমের মাল সংরক্ষণের সীমা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ—অর্থাৎ সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে গেলে অভিভাবকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। অতঃপর তার মাল তার কাছে সমর্পণ করতে হবে।

أشد শব্দের প্রকৃত অর্থ শক্তি। আলিমদের মতে বয়ঃপ্রাপ্ত হলেই এর সূচনা হয়। বালক-বালিকার মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা দিলে কিংবা বয়স পনের বছর পূর্ণ হয়ে গেলে শরীয়ত মতে তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত বলা হবে।

তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর দেখতে হবে, তার মধ্যে নিজের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং শুদ্ধ খাতে ব্যয় করার যোগ্যতা হয়েছে কি না। যোগ্যতা দেখলে বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে। অন্যথায় পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত ধন-সম্পদ হিফাযত করার দায়িত্ব অভিভাবকের। ইতিমধ্যে যখনই ধন-সম্পদ সংরক্ষণ এবং কারবারের যোগ্যতা তার মধ্যে দেখা যাবে, তখনই তার ধন-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করতে হবে। যদি পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্তও তার মধ্যে ঐ যোগ্যতা সৃষ্টি না হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (র)-র মতে তার মাল তাকেই সমর্পণ করতে হবে যদি সে উন্মাদ না হয়। কোন কোন ইমামের মতে তখনও তার মাল তাকে দেওয়া যাবে না, বরং শরীয়তের কাজী (বিচারক) তার মাল সংরক্ষণের জন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করবেন।

এ বিষয়টি কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ—অর্থাৎ ইয়াতীমদের

মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তোমরা যদি এরূপ সুমতি দেখ যে, তারা স্বয়ং মালের হিফাযত করতে পারবে এবং কোন কারবারে নিয়োগ করতে পারবে, তবে তাদের মাল তাদের হাতে সমর্পণ করে দাও। এ আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াই মাল সমর্পণের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং মালের হিফাযত ও কাজ-কারবারের যোগ্যতাও শর্ত।

সপ্তম হারাম ওজন ও মাপে ত্রুটি করা ঃ এ আয়াতে সপ্তম নির্দেশ ওজন ও মাপ ন্যায়ভাবে পূর্ণ করা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। 'ন্যায়ভাবে' বলার উদ্দেশ্য এই যে, যে ওজন করে দেবে, সে প্রতিপক্ষকে কম দেবে না এবং প্রতিপক্ষ নিজ প্রাপ্যের চাইতে বেশী নেবে না। --- (রূহুল মা'আনী)

দ্রব্য আদান-প্রদানে ওজন ও মাপ কম-বেশী করাকে কোরআন কঠোরভাবে হারাম সাব্যস্ত করেছে। যারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের জন্য সূরা মুতাফফিফীনে কঠোর শাস্তিবাণী বর্ণিত হয়েছে।

তফসীরবিদ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ওজন ও মাপের কাজ করে, তাদেরকে সম্বোধন করে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ওজন ও মাপ এমন একটি কাজ যে, এতে অন্যায় আচরণ করে তোমাদের পূর্বে অনেক উম্মত আল্লাহ্র আযাবে পতিত হয়ে গেছে। তোমরা এ ব্যাপারে পুরোপুরি সাবধানতা অবলম্বন কর। ---(ইবনে কাসীর)

কর্মচারী ও শ্রমিকদের নির্ধারিত কর্তব্য কর্মে ত্রুটি করাও ওজন এবং মাপে ত্রুটি করার অনুরূপ ঃ ওজন ও মাপে ত্রুটি করাকে কোরআন পাকে تطفيف বলা হয়েছে। এটা শুধু ওজন করার সময় কমবেশী করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যের প্রাপ্যে ত্রুটি করাও تطفيف-এর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মালিক (র)স্বীয় মুয়াত্তা গ্রন্থে হযরত ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তিকে নামাযের আরকানে ত্রুটি করতে দেখে তিনি বলেছিলেন ঃ তুমি تطفيف করেছ, অর্থাৎ যথার্থ প্রাপ্য শোধ করনি। এ ঘটনা বর্ণনা করে ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ لكل شئى وفاء و تطفيف অর্থাৎ প্রাপ্য পুরোপুরি দেওয়া ও ত্রুটি করা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যেই হয়---শুধু ওজন ও মাপের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়।

এতে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি কর্তব্যকর্ম পূর্ণ করে না, সময় চুরি করে কিংবা কাজে ত্রুটি করে সে-ও উপরোক্ত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত ; সে কোন মন্ত্রী হোক, প্রশাসক হোক কিংবা সাধারণ কর্মচারী হোক অথবা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মে নিয়োজিত হোক না কেন।

এরপর বলা হয়েছে ঃ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا —অর্থাৎ আমি কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দিই না। কোন কোন হাদীসে এর অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সাধ্যমত পুরোপুরি ওজন করে, এতদসত্ত্বেও যদি অনিচ্ছাকৃত-ভাবে ওজনে কমবেশী হয়ে যায় তবে তা মাফ। কেননা, এটা তার শক্তি ও সাধ্যের বাইরে।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ এ বাক্য যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রাপ্য পরিশোধের সময় কিছু বেশী দেওয়াই সতর্কতা ---যাতে কমের সন্দেহ না থাকে। যেমন এরূপ স্থলেই রসূলুল্লাহ্ (সা) ওজনকারীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ زن وارجح অর্থাৎ ওজন কর এবং কিছু ঝুঁকিয়ে ওজন কর।---(আহ্মদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাধারণ অভ্যাস তাই ছিল। তিনি কারও প্রাপ্য পরিশোধ করার সময় প্রাপ্যের চাইতে কিছু বেশী দেওয়া পছন্দ করতেন। বুখারীতে বর্ণিত হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি সদয় হন, যে বিক্রয়ের সময় নম্রতা প্রদর্শন করে। অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে বেশী দেয় এবং ক্রয়ের সময়ও নম্রতা দেখায় অর্থাৎ প্রাপ্যের চাইতে বেশী নেয় না ; বরং সামান্য কম হলেও সন্তুষ্ট থাকে।"

কিন্তু দেওয়ার বেলায় বেশী দেওয়া এবং নেওয়ার বেলায় কম হলেও ঝগড়া না করার এ নির্দেশটি নৈতিক---আইনগত নয় যে, এরূপ করতেই হবে। এদিকে ইঙ্গিত করার জন্যই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ আমি কাউকে তার সাধ্যাতিরিক্ত কাজের নির্দেশ দিই না অর্থাৎ অপরকে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশী পরিশোধ করা এবং নিজের বেলায় কমে সম্মত হওয়া কোন বাধ্যতামূলক আদেশ নয়। কেননা, সাধারণ লোকের পক্ষে এরূপ করা সহজ নয়।

অষ্টম নির্দেশ ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীত করা হারাম ঃ বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ---অর্থাৎ 'তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে, যদিও সে আত্মীয় হয়।' এখানে বিশেষ কোন কথার উল্লেখ নেই। তাই সাধারণ তফসীরবিদদের মতে সব রকম কথাই এর অন্তর্ভুক্ত। কোন ব্যাপারের সাক্ষ্য হোক কিংবা বিচারকের ফয়সালা হোক অথবা পারস্পরিক বিভিন্ন প্রকার কথাবার্তাই হোক---সব ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও সত্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মোকদ্দমার সাক্ষ্যে কিংবা ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ এই যে, ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যা জানা আছে, নিজের পক্ষ থেকে কমবেশী না করে তা পরিষ্কার বলে দেওয়া---অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে কোন কথা না বলা এবং এতে কারও উপকার কিংবা কারও লোকসানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। মোকদ্দমার ফয়সালায় সাক্ষীদের শরীয়তের নীতি অনুযায়ী যাচাই করার পর তাদের সাক্ষ্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা যা প্রমাণিত হয়, তাই ফয়সালা করা। সাক্ষ্য ও ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং কারও শত্রুতা ও বিরোধিতা সত্য বলার পথে অন্তরায় না হওয়া উচিত। এ কারণেই আয়াতে وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ বাক্যটি যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যার মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেবে কিংবা ফয়সালা করবে, সে তোমার নিকটাত্মীয় হলেও ন্যায় ও সত্যকে কোন অবস্থাতেই হাত-ছাড়া করবে না।

মিথ্যা সাক্ষ্য ও অসত্য ফয়সালা প্রতিরোধ করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য। মিথ্যা সাক্ষ্য সম্পর্কে আবূ দাউদ ও ইবনে মাজায় নিম্নোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

"মিথ্যা সাক্ষ্য শিরকীর সমতুল্য।" রসূলুল্লাহ্ (সা) এ বাক্য তিনবার বলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ -

অর্থাৎ মূর্তিপূজার কুৎসিত বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা সাক্ষ্য থেকে দূরে সরে থাক,---আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার না করা অবস্থায়।

এমনিভাবে অসত্য ফয়সালা সম্পর্কে আবূ দাউদ হযরত বরীদা (রা)-র রেওয়ায়েত-ক্রমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ উক্তি বর্ণনা করেন ঃ

কাজী (অর্থাৎ মোকদ্দমার বিচারক) তিন প্রকার। তন্মধ্যে এক প্রকার জান্নাতে ও দুই প্রকার জাহান্নামে যাবে। যে কাজী শরীয়তের নীতি অনুযায়ী মামলার তদন্ত করে সত্য ঘটনার জ্ঞান অর্জন করে অতঃপর তদনুযায়ী ফয়সালা করে, সে জান্নাতী। পক্ষান্তরে যে তদন্ত করে সত্য অবগত হওয়ার পর জেনেশুনে অসত্য ফয়সালা করে, সে জাহান্নামী। এমনিভাবে যার কোন জ্ঞান নেই কিংবা তদন্ত ও চিন্তাভাবনায় ত্রুটি করে এবং অজ্ঞতার অন্ধকারে থেকেই ফয়সালা করে, সেও জাহান্নামে যাবে।

সাক্ষ্য কিংবা ফয়সালায় কারও বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা এবং শত্রুতা ও বিরোধিতার কোন প্রভাব থাকা উচিত নয়---এ বিষয়টি কোরআনের অন্যান্য আয়াতে আরও পরিষ্কার ও তাকীদ সহকারে বর্ণিত হয়েছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ—অর্থাৎ যদিও তোমার নিজের অথবা পিতামাতার ও আত্মীয়-স্বজনের বিপক্ষে যায়, তবুও সত্য কথা বলতে কুণ্ঠিত হয়ো না। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا—অর্থাৎ কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদের অসত্য সাক্ষ্য দিতে কিংবা অন্যায় ফয়সালা করতে উদ্বুদ্ধ না করে। পারস্পরিক কথাবার্তায় ন্যায় ও সত্য কায়েম রাখার অর্থ মিথ্যা না বলা, অসাক্ষাতে পরনিন্দা না করা এবং কষ্টদায়ক কিংবা আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতিকারক কথাবার্তা না বলা।

নবম নির্দেশ ঃ আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা ঃ এ আয়াত নবম নির্দেশ আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং তা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা সম্পর্কিত।

বলা হয়েছে ঃ وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এর অর্থ ঐ অঙ্গীকারও হতে পারে, যা রূহের জগতে অবস্থান করার সময় প্রত্যেক মানুষের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। তখন সব মানুষকে বলা হয়েছিল أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সবাই সমস্বরে উত্তর দিয়েছিল ঃ بَلَى অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের প্রতিপালক। এ অঙ্গীকারের দাবী হল এই যে, প্রতিপালকের নির্দেশ অমান্য করা যাবে না। তিনি যে কাজের আদেশ দেন, তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তিনি যে কাজে নিষেধ করেন, তার কাছেও যাওয়া যাবে না এবং সন্দেহযুক্ত কাজ থেকেও বাঁচতে হবে। অঙ্গীকারের সার কথা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার পুরোপুরি আনুগত্য করতে হবে।

এছাড়া এর অর্থ কোরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত বিশেষ বিশেষ অঙ্গীকারও হতে পারে। বর্ণিত তিনটি আয়াত এদের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর তফসীর করা হচ্ছে এবং যেগুলোতে দশটি নির্দেশ তাকীদ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

আলিমগণ বলেন ঃ নযর, মান্নত ইত্যাদি পূর্ণ করাও এ অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত। এতে অমুক কাজ করব কিংবা করব না বলে মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে অঙ্গীকার করে। কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতেও একথা পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ অর্থাৎ আল্লাহ্র সৎ বান্দারা মান্নত পূর্ণ করে।

মোট কথা, এ নবম নির্দেশটি গণনার দিক দিয়ে নবম হলেও স্বরূপের দিক দিয়ে শরীয়তের যাবতীয় আদেশ-নিষেধের মধ্যে পরিব্যাপ্ত।

দ্বিতীয় আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এসব কাজের জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

তৃতীয় আয়াতে দশম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ـ

অর্থাৎ এ শরীয়তে মুহাম্মদী আমার সরল পথ। অতএব তোমরা এ পথে চল এবং অন্য কোন পথে চল না। কেননা, সেসব পথ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

এখানে هذا শব্দ দ্বারা দীনে ইসলাম অথবা কোরআনের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। সূরা আন-আমের প্রতিও ইশারা হতে পারে। কেননা, এতেও ইসলামের যাবতীয় মূলনীতি তওহীদ, রিসালত এবং মূল বিধি-বিধান ব্যক্ত হয়েছে। مستقيم শব্দটি صراط-এর বিশেষণ। কিন্তু ব্যাকরণিক দিক দিয়ে একে حال উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সরল হওয়া ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশেষণ। এরপর বলা হয়েছে ঃ فَاتَّبِعُوْهُ

অর্থাৎ ইসলামই যখন আমার পথ এবং এটাই যখন সরল পথ তখন মনযিলে মকসুদের সোজা পথ হাতে এসে গেছে। তাই এ পথেই চল।

এরপর বলা হয়েছে ঃ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ — سُبُل

শব্দটি سَبِيْل-এর বহুবচন। এর অর্থও পথ। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আসল পথ তো একটিই, জগতে যদিও মানুষ নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী অনেক পথ করে রেখেছে। তোমরা এসব পথে চলো না। কেননা, এসব পথ বাস্তবে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে না। কাজেই যে এসব পথে চলবে, সে আল্লাহ্ থেকে দূরে সরে পড়বে।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে ঃ কোরআন পাক ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রেরণ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, ইচ্ছা ও পছন্দকে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র ছাঁচে ঢেলে নিক এবং জীবনকে এরই অনুসারী করে নিক। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই যে, মানুষ কোরআন ও সুন্নাহ্‌কে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও পছন্দের ছাঁচে ঢেলে নিতে চাচ্ছে। কোন আয়াত কিংবা হাদীসকে নিজের মতলব বা ধারণার বিপরীত দেখলে তারা তার মনগড়া ব্যাখ্যা করে স্বীয় প্রবৃত্তির পক্ষে নিয়ে যায়। এখান থেকেই অন্যান্য বেদ'আত ও পথভ্রষ্টতার জন্ম। আয়াতে এসব পথ থেকে বেঁচে থাকতেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মসনদে দারেমীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসঊদ (রা) থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একটি সরল রেখা টেনে বললেন ঃ এটা আল্লাহ্‌র পথ অতঃপর এর ডানে-বামে আরও অনেকগুলো রেখা টেনে বললেন ঃ এগুলো سبل (অর্থাৎ আয়াতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ পথসমূহ)। তিনি আরও বললেন, এর প্রত্যেকটি পথে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। এরা মানুষকে সরল পথ থেকে সরিয়ে এদিকে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এ বিষয়ে জোর নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযমী হও।

আয়াতদ্বয়ের তফসীর এবং এগুলোতে বর্ণিত দশটি নির্দেশের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হল। উপসংহারে কোরআন পাকের এ বর্ণনাপদ্ধতির প্রতিও লক্ষ্য করুন যে, উল্লিখিত দশটি নির্দেশকে বর্তমান কালে প্রচলিত আইন গ্রন্থের মত দশ দফায় লিপিবদ্ধ করা হয়নি; বরং প্রথমে পাঁচটি নির্দেশ বর্ণনা করার পর বলেছেন ঃ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অতঃপর চারটি নির্দেশ ব্যক্ত করার পর এ تَعْقِلُوْنَ এর স্থলে تَذَكَّرُوْنَ-এর পরিবর্তনসহ উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বশেষ নির্দেশটি একটি স্বতন্ত্র আয়াতে উল্লেখ করে এ বাক্যটিকেই আবার تَذَكَّرُوْنَ এর স্থলে تَتَّقُوْنَ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন পাকের এ বিজ্ঞজনোচিত বর্ণনা ভঙ্গিতে বহু তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। প্রথমত এই যে, কোরআন পাক জগতের সাধারণ আইনসমূহের মত একটি শাসকসুলভ আইন নয়, বরং সহৃদয় আইন। তাই প্রত্যেক আইনের সাথে তাকে সহজসাধ্য করার কৌশলও ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার পরিচয়জ্ঞান ও পরকাল চিন্তাই মানুষকে নির্জনে ও জনসমক্ষে আইনের অনুগামী হতে বাধ্য করে। এ কারণেই তিনটি আয়াতের শেষভাগেই এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, যা মানুষের চিন্তাধারাকে বস্তুজগত থেকে আল্লাহ্ ও পরকালের দিকে ঘুরিয়ে দেয়।

প্রথম আয়াতে পাঁচটি নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে ঃ এক. শিরক থেকে আত্মরক্ষা করা, দুই. পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে আত্মরক্ষা করা, তিন. সন্তান হত্যা থেকে বিরত থাকা, চার. নির্লজ্জ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং পাঁচ. অন্যায় হত্যা থেকে বিরত হওয়া। এগুলোর শেষে تَعْقِلُوْنَ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, জাহিলিয়াতযুগে এগুলোকে কেউ দোষ বলে মনে করত না। তাই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পৈতৃক কুপ্রথা ও ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করে বুদ্ধিকে কাজে লাগাও।

দ্বিতীয় আয়াতে চারটি নির্দেশ উল্লিখিত হয়েছে ঃ এক. ইয়াতীমের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ না করা, দুই. ওজন ও মাপে ত্রুটি না করা, তিন. কথাবার্তায় ন্যায় ও সততার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং চার. আল্লাহ্র অঙ্গীকার পূর্ণ করা (যাঁর সাথে তোমরা অঙ্গীকৃত)।

এসব বিষয় পূরণ করা যে জরুরী, তা যে কোন অজ্ঞ লোকও জানে এবং জাহেলিয়াত যুগের কিছু লোক তা পালন করতো; কিন্তু অধিকাংশই ছিল গাফিল। এ গাফলতির প্রতি-

কার হচ্ছে আল্লাহ্ ও পরকালকে স্মরণ রাখা। তাই এ আয়াতের শেষে تَذَكَّرُونَ ব্যবহার করা হয়েছে।

তৃতীয় আয়াতে সরল পথ অবলম্বন করা এবং এর বিপরীত অন্য সব পথ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। একমাত্র আল্লাহ্ভীতিই মানুষকে রিপু ও প্রবৃত্তির তাড়ন থেকে বিরত রাখতে সহায়ক হতে পারে। তাই এর শেষে تَتَّقُونَ বলা হয়েছে।

তিন জায়গাতেই وَصَّىٰكُمْ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ জোর নির্দেশ।

এ কারণেই কোন কোন সাহাবী বলেন ঃ যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মোহরাঙ্কিত ওসীয়ত-নামা দেখতে চায়, সে যেন এ তিনটি আয়াত পাঠ করে।

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيْٓ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ
شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ ﴿١٥٤﴾ وَهٰذَا كِتٰبٌ
اَنْزَلْنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿١٥٥﴾ اَنْ تَقُوْلُوْٓا
اِنَّمَآ اُنْزِلَ الْكِتٰبُ عَلٰى طَآئِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ۪ وَاِنْ كُنَّا عَنْ
دِرَاسَتِهِمْ لَغٰفِلِيْنَ ﴿١٥٦﴾ اَوْ تَقُوْلُوْا لَوْ اَنَّآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّآ
اَهْدٰى مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ۚ
فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۭ سَنَجْزِي
الَّذِيْنَ يَصْدِفُوْنَ عَنْ اٰيٰتِنَا سُوْٓءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ﴿١٥٧﴾

(১৫৪) অতঃপর আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি, সৎকর্মীদের প্রতি নিয়ামত পূর্ণ করার জন্য, প্রত্যেক বস্তুর বিশদ বিবরণের জন্য, হিদায়তের জন্য এবং করুণার জন্য—যাতে তারা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়। (১৫৫) এটি এমন একটি গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি, খুব মঙ্গলময়, অতএব এর অনুসরণ কর এবং ভয় কর—যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। (১৫৬) এ জন্য যে কখনও তোমরা বলতে শুরু কর ঃ গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দু' সম্প্রদায়ের প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমরা সেগুলোর পাঠ ও পঠন সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। (১৫৭) কিংবা

বলতে শুরু করঃ যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, আমরা এদের চাইতে অধিক পথপ্রাপ্ত হতাম। অতএব, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ, হিদায়ত ও রহমত এসে গেছে। অতঃপর সে ব্যক্তির চাইতে অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা বাঁচিয়ে চলে। অতি সত্বর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব, যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে—জঘন্য শাস্তি তাদের গা বাঁচানোর কারণে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (শিরক খণ্ডন করার পর আমি নবুয়ত সম্পর্কে আলোচনা করছি, আমি একা আপনাকেই নবী করিনি, যদ্দরুন তারা এত হৈ চৈ করছে; বরং আপনার পূর্বেও) আমি মূসা (আ)-কে (পয়গম্বর করে) গ্রন্থ (তওরাত) দিয়েছিলাম যাতে সৎকর্মীদের প্রতি (আমার) নিয়ামত পূর্ণ হয় এবং (মান্যকারীদের জন্য) করুণা হয়, (আমি এ ধরনের গ্রন্থ এজন্য দিয়েছিলাম) যেন তারা (বনী ইসরাইলরা) স্বীয় পালনকর্তার সামনে উপস্থিতির ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করে (এবং এ উপস্থিতির প্রতি বিশ্বাসের কারণে সব বিধি-বিধান পালন করে) এবং (যখন তওরাত ও তওরাতের পরিশিষ্ট ইঞ্জীলের কার্যকাল শেষ হয়ে গেল,) তখন এ (কোরআন এমন) একটি গ্রন্থ, যা আমি (আপনার কাছে) প্রেরণ করেছি যা খুব মঙ্গলময়। অতএব (এখন) এরই অনুসরণ কর এবং (এর বিরুদ্ধাচরণ করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে) ভয় কর, যাতে তোমাদের প্রতি (আল্লাহ্‌র) রহমত হয়। (আর আমি এ কোরআন এ কারণেও অবতীর্ণ করেছি,) যেন (কখনও) তোমরা (এটি অবতীর্ণ না হওয়া অবস্থায় কিয়ামতে কুফর ও শিরকের শাস্তি দেওয়ার সময়) না বল যে, (ঐশী) গ্রন্থ তো কেবল আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃস্টানদের) প্রতিই অবতীর্ণ হয়েছিল এবং আমরা তাদের পাঠ-পঠন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম (তাই তওহীদ সম্পর্কে জানতে পারিনি) অথবা (পূর্ববর্তী অন্যান্য মু'মিনের সওয়াব পাওয়ার সময়) এমন (না) বল যে, যদি আমাদের প্রতি কোন গ্রন্থ অবতীর্ণ হত, তবে আমরা এদের (অর্থাৎ পূর্ববর্তী এসব মু'মিনের) চাইতে অধিক পথপ্রাপ্ত হতাম (এবং বিশ্বাস ও কর্মে তাদের চাইতে বেশী গুণ অর্জন করে সওয়াবের অধিকারী হতাম)। অতএব (স্মরণে রেখো যে,) এখন (তোমাদের কোন অজুহাত নেই) তোমাদের কাছে (ও) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে (একটি গ্রন্থ, যার নির্দেশাবলী) সুস্পষ্ট এবং (যা) পথ-প্রদর্শনের উপায় এবং (আল্লাহ্‌র) করুণা (তা) এসে গেছে। অতঃপর (এমন পরিপূর্ণ ও সন্তোষজনক গ্রন্থ আসার পর) সে ব্যক্তির চাইতে অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলে এবং (অন্যান্য-কেও) এ থেকে বিরত রাখে? আমি সত্বরই (পরকালে) যারা আমার নিদর্শনসমূহ থেকে বাধা প্রদান করে, তাদেরকে এ বাধা প্রদানের কারণে কঠোর শাস্তি দেব। (এ কঠোরতা বাধা প্রদানের কারণে, নতুবা শুধু মিথ্যা বলাই শাস্তির কারণ হতে পারত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

গাফিল থাকার কারণ এটা নয় যে, তওরাত ও ইঞ্জীল আরবী ভাষায় ছিল না, কেননা অনুবাদের মাধ্যমে বিষয়বস্তু জানা সম্ভবপর ও বাস্তবসম্মত। বরং কারণ এই যে, আহ্‌লে-কিতাবরা আরবদের শিক্ষা ও একত্ববাদের ব্যাপারে কখনও যত্নবান হয়নি। ঘটনাচক্রে কোন কোন বিষয়বস্তু পড়ে যাওয়া হুঁশিয়ার হওয়ার ব্যাপারে ততটুকু কার্যকর নয়। তবে এতটুকু হুঁশিয়ারির কারণে একত্ববাদের জ্ঞান অনুসন্ধান ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ওয়াজিব হয়ে যায় এবং এ কারণেই একত্ববাদ বর্জন করার জন্য আরবদের শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর ছিল। এতে একথা জরুরী হয় না যে, তাহলে হযরত মূসা ও ঈসা (আ)-র নবুয়ত ব্যাপক ও সবার জন্য ছিল। এরূপ নয়, বরং এ ধরনের ব্যাপকতা আমাদের পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা)-এরই বৈশিষ্ট্য এবং তা মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখা উভয়ের সমষ্টির দিক দিয়ে। নতুবা মূলনীতিতে সকল পয়গম্বরের অনুসরণই সব মানুষের জন্য জরুরী। সুতরাং এ দিক দিয়ে আরবদেরকে শাস্তি দেওয়া অশুদ্ধ হত না কিন্তু আয়াতে বর্ণিত অজুহাতটি বাহ্যদৃষ্টিতে পেশ করা সম্ভবপর ছিল। এখন তারও আর অবকাশ রইল না এবং আল্লাহ্‌র যুক্তি পূর্ণ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় উক্তি لَوْ اَنَّا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبُ لَكُنَّا اَهْدٰى مِنْهُمْ সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ও উত্তর নবুয়তের বিরতিকালে অবস্থান করার কারণে যারা মুক্তি পাবে, তাদের সম্পর্কে সূরা মায়েদার তৃতীয় রুকূর শেষ দিকে বর্ণিত হয়েছে।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ؕ يَوْمَ يَاْتِيْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْٓ اِيْمَانِهَا خَيْرًا ؕ قُلِ انْتَظِرُوْٓا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝

(১৫৮) তারা শুধু এ বিষয়ের দিকে চেয়ে আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে কিংবা আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন অথবা আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে। যেদিন আপনার পালনকর্তার কোন নিদর্শন আসবে, সেদিন এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে পূর্ব থেকে বিশ্বাস স্থাপন করেনি কিংবা স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোনরূপ সৎকর্ম করেনি। আপনি বলে দিন ঃ তোমরা পথের দিকে চেয়ে থাক, আমরাও পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (যারা গ্রন্থ ও প্রমাণাদি অবতরণ এবং সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বাস স্থাপন

করে না—বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য) শুধু এ বিষয়ের অপেক্ষমান (অর্থাৎ মনে হয় এমন বিলম্ব করছে, যেমন কেউ অপেক্ষা করছে) যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করবে অথবা তাদের কাছে আপনার পালনকর্তা আগমন করবেন (যেমন কিয়ামতে হিসাব-কিতাবের সময় হবে) অথবা আপনার পালনকর্তার কোন বড় নিদর্শন (কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্য থেকে) আসবে—(বড় নিদর্শনের অর্থ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হওয়া। তারা এ সম্পর্কে শুনে রাখুক যে) যে দিন আপনার পলানকর্তার (উল্লিখিত এই) বড় নিদর্শন আসবে। (সেদিন) এমন কোন ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপন তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না, যে (ইতি) পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি (বরং সেদিনই বিশ্বাস স্থাপন করেছে)। অথবা (বিশ্বাস স্থাপন পূর্বেই করেছে, কিন্তু) স্বীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কোন সৎকর্ম করেনি (বরং কুকর্ম ও গোনাহে লিপ্ত রয়েছে, এবং সেদিন তওবা করত সৎকর্ম শুরু করে। এমতাবস্থায় তার তওবা গ্রহণীয় হবে না। পূর্বে যদি তওবা করত, তবে ঈমানের বরকতে তওবা গ্রহণীয় হত। অতএব গ্রহণীয় হওয়া ঈমানের অন্যতম উপকারিতা। এখনকার ঈমান সে উপকার করবে না। কিয়ামতের লক্ষণই যখন ঈমান ও তওবা গ্রহণীয় হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে গেছে, তখন বাস্তব কিয়ামত আরও নিঃসন্দেহরূপে অন্তরায় হবে। অতএব অপেক্ষা কিসের জন্য? এ হুঁশিয়ারির পরও যদি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে) আপনি (আরও হুঁশিয়ার করার জন্য) বলে দিন ঃ (আচ্ছা ভাল) তোমরা (এসব বিষয়ের জন্য) অপেক্ষা করতে থাক, (এবং মুসলমান না হতে চাও তো না হও) আমরাও (এসব বিষয়ের জন্য) অপেক্ষা করছি। (তখন তোমরা বিপদে পতিত হবে এবং আমরা মু'মিনরা ইনশাআল্লাহ্ মুক্তি পাব)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা আন-আ'মের অধিকাংশই মক্কাবাসী ও আরব-মুশরিকদের বিশ্বাস ও ক্রিয়া-কর্মের সংস্কার এবং তাদের সন্দেহ ও প্রশ্নের জওয়াবে অবতীর্ণ হয়েছে।

গোটা সূরায় এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে মক্কা ও আরবের অধিবাসীদের সামনে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মো'জেযা ও প্রমাণাদি দেখে নিয়েছ, তাঁর সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও পয়গম্বরদের ভবিষ্যদ্বাণীও শুনে নিয়েছ এবং একজন নিরক্ষরের মুখ থেকে কোরআনের সুস্পষ্ট আয়াত শোনার মো'জেযাটিও লক্ষ্য করেছ। এখন ন্যায় ও সত্যের সমুদয় পথ তোমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। অতএব, বিশ্বাস স্থাপনের জন্য আর কিসের অপেক্ষা?

এ বিষয়টি আলোচ্য আয়াতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে বলা হয়েছে ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَاْتِيَ رَبُّكَ اَوْ يَاْتِيَ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ ـ

অর্থাৎ তারা কি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, মৃত্যুর ফেরেশতা